জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি

শফি চাকলাদার

জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি

শফি চাকলাদার

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি
শফি চাকলাদার

ই.ফা.বা. প্রকাশনা : ১৫৩৪
ই.ফা.বা. গ্রন্থাগার : ৯২৮.৯১৪৪

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন ১৩৯৪
রজব ১৪০৮
মার্চ ১৯৮৮

প্রকাশক :
মুহাম্মদ লুতফুল হক
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদ :
মামুন কায়সার

মুদ্রক :
পূর্ববঙ্গ প্রেস
২, জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা—১১০০

বাঁধাইকার :
জহীর এণ্ড সন্স
জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা—১১০০

মূল্য : আঠার টাকা

JEEBAN SAYANHER NAZRULKEY JEMON DEKHECHHI: Nazrul, as I have seen in his last days, written in Bengali by Shafi Chaklader, published by Muhammad Lutful Haque, Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka—1000. March 1988
Price : Tk. 18·00 ; U.S. $: 1·50

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নজরুল ইসলামের সম্পূর্ণ জীবনী আজও লেখা হয় নি। এই জীবনী লেখা সম্ভবতঃ আরও কিছু সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সম্ভব হবে। নজরুলের বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত প্রেমিক যাঁরা তাঁর সমকালীন, অগ্রজ বা অনুজ তাঁদের সকলের নজরুল সম্বন্ধীয় স্মৃতিকথা তাঁর বিচিত্র বিশাল জীবনী লিখতে সাহায্য করবে।

নজরুলের সমকালীন বন্ধু ও ভক্তরা অনেকেই এই ধরনের স্মৃতিকথা-ধর্মী প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সব লেখায় তাঁর সুস্থ সময়ের জীবন সম্বন্ধে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু কবির অসুস্থকালীন সময়ের কথা সেখানে খুব কম আছে। সূফী জুলফিকার হায়দার 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়'-এ অসুস্থ নজরুল সম্পর্কে অনেকের অজানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। শফি চাকলাদারের 'জীবন সায়াহ্নের নজরুলকে যেমন দেখেছি' তেমনি একটি বই যেখানে অসুস্থ নজরুল সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক কথা আছে।

নজরুল-প্রেমিক শফি চাকলাদার ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত অসুস্থ নজরুলের সঙ্গে থাকার ও তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করার সুযোগ পান। এই সময়ের প্রতিদিনের নজরুল সম্পর্কে যে দিনপঞ্জী তিনি লিখেছেন তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি ভবিষ্যত নজরুল গবেষকদের গবেষণা কর্মের জন্যে এক মহামূল্যবান দলিল। এই বই যে নজরুল-জীবনী রচনার এক অপরিহার্য তথ্য বলে গণ্য হবে সেই বিবেচনায় বইটি প্রকাশ করা হল। আল্লাহ্ আমাদের সকল ভালো কাজে তৌফিক দিন।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক

লেখার তেমন অভ্যেস নেই। তবু এ বই লিখেছি। নজরুলকে ভালবাসি বলে তিনি ঢাকায় এলে তাঁকে সেবা করতে এগিয়ে যাই। সেখানে নজরুলকে যেভাবে দেখেছি তাইসহ কিছু তথ্যগত বক্তব্য এবং দায়িত্ব পালন এবং 'শুধু সেবাই নয়, নজরুলের পাশে থেকে যা উপলব্ধি করেছি' তারই বিবরণ আমি দেয়ার চেষ্টা করেছি। নজরুলকে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে এ যাবৎ উপেক্ষার বর্ণনাও এতে রয়েছে। তার সঙ্গীতের ব্যবহার কিভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কেও কিছু কথা আছে। সামগ্রিকভাবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে আসার পর নজরুলের ঢাকার জীবন নিয়ে বর্ণনা এ গ্রন্থে রয়েছে যা নজরুল কৌতুহলীদের জানার বাসনা পূর্ণ করতে সাহায্য করবে বলে আশা রাখি। বইটি বের হতে দেরী হল। ইতিপূর্বে বইটি 'মুক্তধারা'য় দিয়েছিলাম—তারা বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্তও নেয়। কিন্তু চুক্তিপত্র সই করতে গিয়ে তথ্যগত কিছু অংশ বাদ দিতে হবে জানালে আমি বইটি প্রকাশ করতে রাজী হই নি। এরপর চুরুলিয়া থেকে (নজরুল একাডেমী) বইটি প্রকাশ করার জন্য পাণ্ডুলিপি দেয়া হয়—অজ্ঞাত কারণে সেখান থেকেও বইটি ছাপা হয়নি, পাণ্ডুলিপিটিও ফেরত আসেনি। অবশেষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এজন্য তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শফি চাকলাদার

'ইয়র্ক হাউস'
১/১, উত্তর আদাবর
ঢাকা হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা—৭

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার আব্বা

আমার শ্রদ্ধেয়া মা ও স্নেহের আরজু

এবং

আমার চিরদিনের সঙ্গিনী

বেগম সেলিমা শফি চাকলাদারকে

www.pathagar.com

সূচীপত্র

আমার কিছু কথা	১
ঢাকায় কবি এলেন	৩
কিছু তথ্যগত বক্তব্য এবং দায়িত্ব পালন	৬
কবির কি করে সময় কাটতো—সকাল	১০
কবির কি করে সময় কাটতো—দুপুর	১২
কবির কি ক'রে সময় কাটতো—বিকাল	১৩
কবির কি ক'রে সময় কাটতো—রাত	১৪
কবির কি ক'রে সময় কাটতো—অন্যান্য	১৬
শুধু সেবাই নয় নজরুলের পাশে থেকে যা উপলব্ধি করেছি	২৩
ভক্তদের মাঝে নজরুল এবং	৩৬
৭৩ তম জন্মজয়ন্তী	৩৯
৭৪ তম জন্মজয়ন্তী	৪০
৭৫ তম জন্মজয়ন্তী	৪২
৭৬ তম জন্মজয়ন্তী—ভিন্ন পরিবেশে	৪৩
৭৭ তম জন্মজয়ন্তী—হাসপাতালে	৪৫
কয়েকটি কথা	৪৭
পিজি হাসপাতাল—১১৭ নং কেবিন এবং প্রসঙ্গ কথা	৫০
কয়েকটি অনুষ্ঠানে নজরুল	৬৫
কয়েকটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে মিশে গেছে	৭৪
সংযোজন	৮৭
দু'টি সাক্ষাৎকার এবং একটি লেখা	৮৮

www.pathagar.com

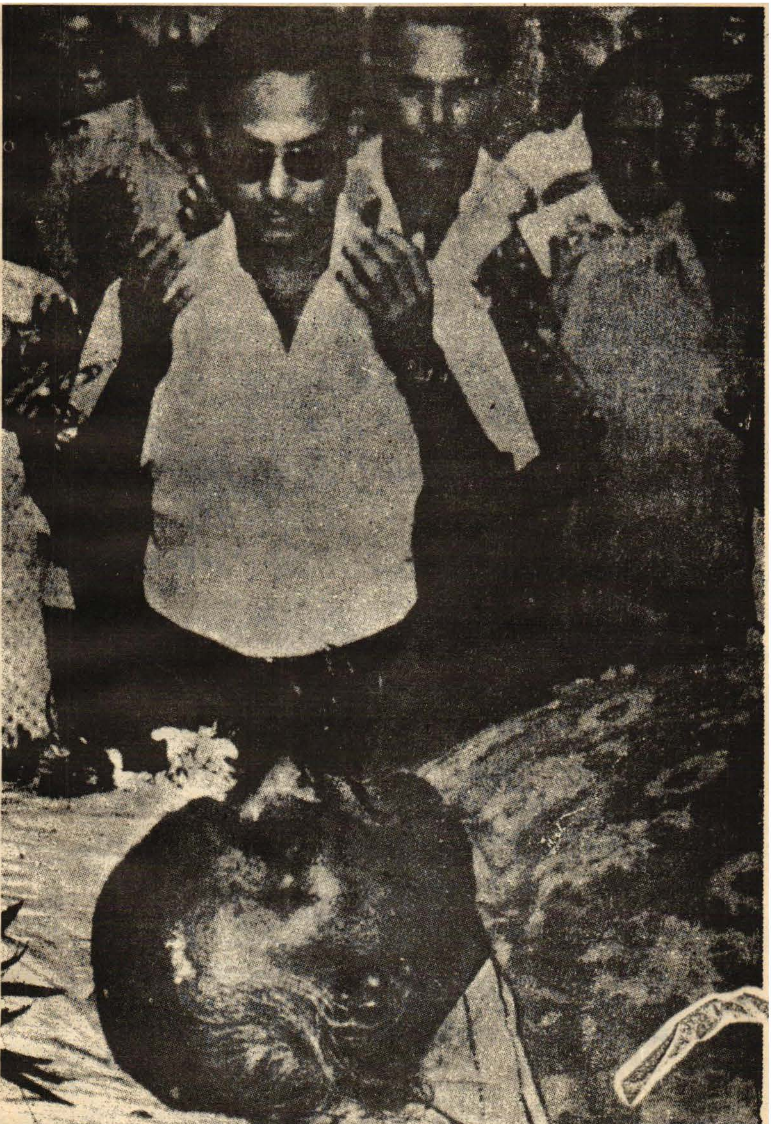

কবির মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে [তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষ] প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা ক'রে মোনাজাত করছেন। ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬।

www.pathagar.com

------চির নিদ্রায়।

www.pathagar.com

কবিকে পোশাক পরাবার সময়
এমনি মনোযোগী হয়ে রইতেন

কাপড় পরছেন কবি

কবিকে তাঁর ৭৬তম জন্মজয়ন্তীতে ভক্তদের মাঝে যেতে দেখা যাচ্ছে।
পাশে লেখক এবং স্বপন

www.pathagar.com

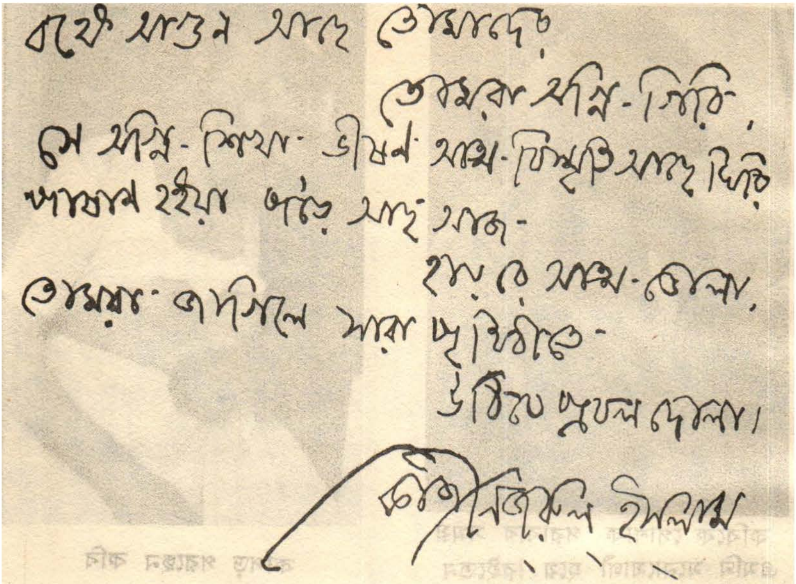
বক্ষে আগুন আছে তোমাদেরি,
তোমরা অগ্নি-গিরি,
সে অগ্নি-শিখা ভীষণ আত্ম-বিস্মৃতি আছে ঘিরি
পাষাণ হইয়া আছে আজ সাজ-
হায় রে আত্ম-ভোলা,
তোমরা জাগিলে সারা পৃথিবীতে-
উঠিবে তুমুল দোলা।

কাজী নজরুল ইসলাম

কবির একটি হস্তলিপি। সৌজন্যে কাজী মযহার হুসেন (কবি নজরুলের ছোট ভাই কাজী আলী হুসেন সাহেবের পুত্র)

পিজি হাসপাতাল থেকে ট্রাকযোগে টি. এস. সি. হল-এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কবির লাশ।

www.pathagar.com

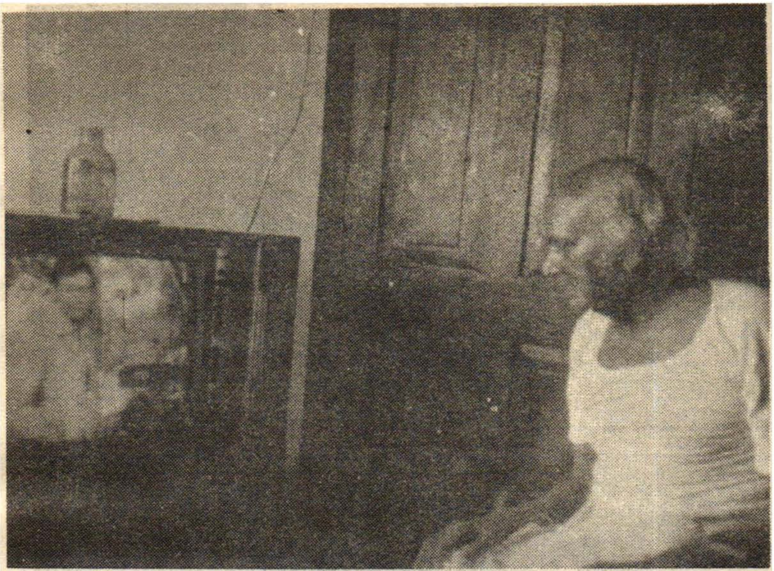

----টিভি দেখছেন

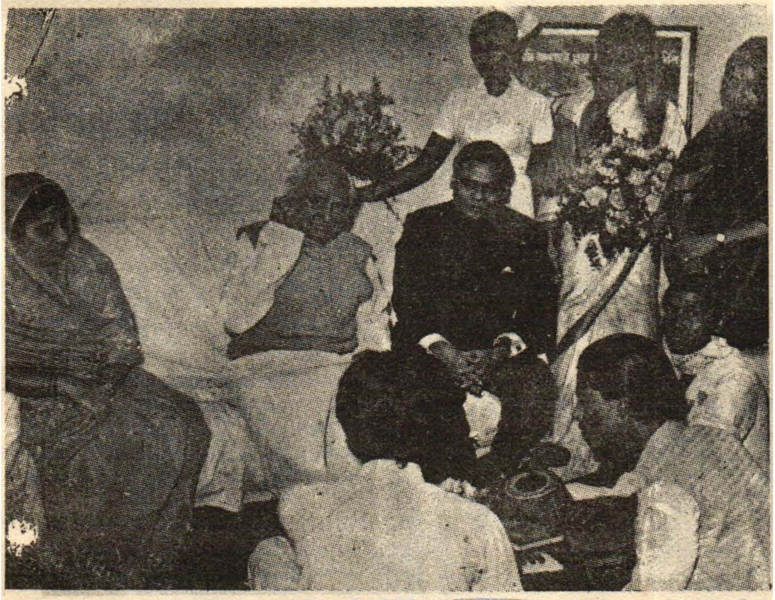

রাষ্ট্রপ্রধান জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী সস্ত্রীক ধানমণ্ডিস্থ বাড়ীতে কবি নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেন

www.pathagar.com

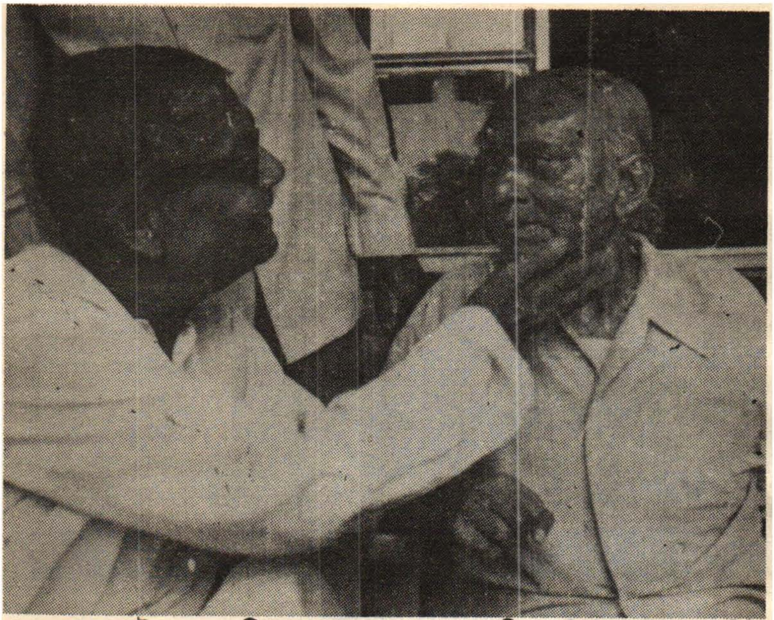

"বাংলার দুই নয়নমণি"—নজরুল এবং জসীম—পিজি হাসপাতালে ১১৭ নং কেবিনে

দুই দিকপাল—নজরুল এবং ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ---- কবি ভবনে গৃহীত ছবি

www.pathagar.com

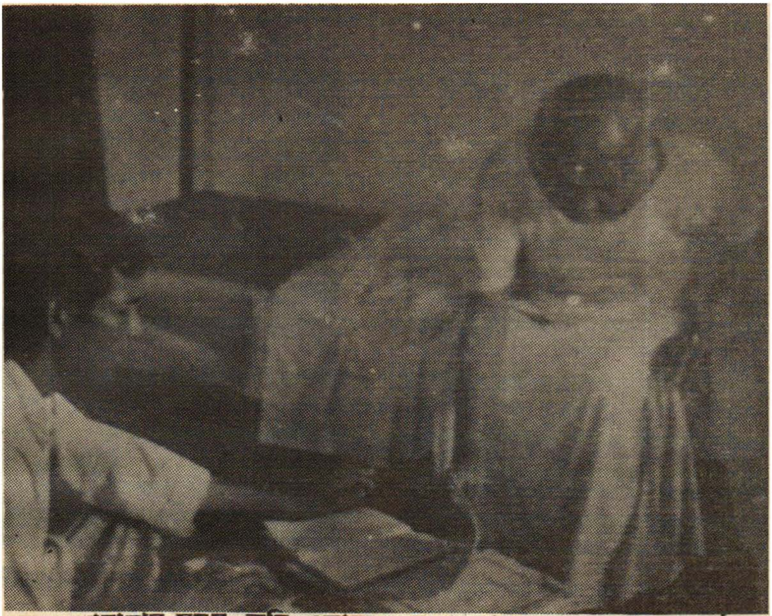

গান শোনাবার সময় কবি এভাবেও ব্যস্ত থাকতেন—গান শোনাচ্ছেন লেখক

এভাবে গানের খাতা দেখে গান গাইতে ইঙ্গিত করতেন

www.pathagar.com

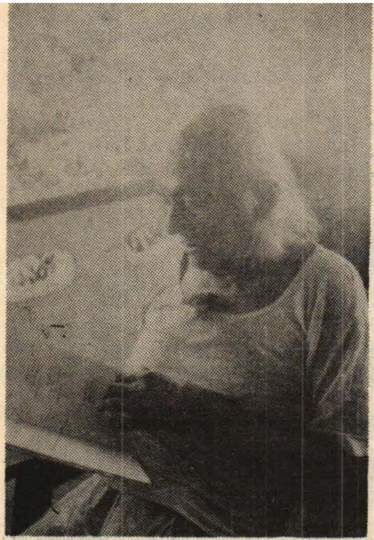

- - - -পাতা উল্টাচ্ছেন

ভেতরে যাব- - - -দেখি দরজাটা খোলা যায় কি না?

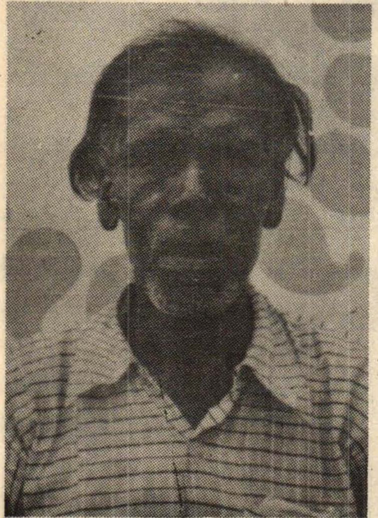

কিশোর সালুকুশা—৪২ বছর কবির সাথে যাঁর কেটেছে—এখন প্রত্যহ... কবির মাযারে অন্তত একবার যান

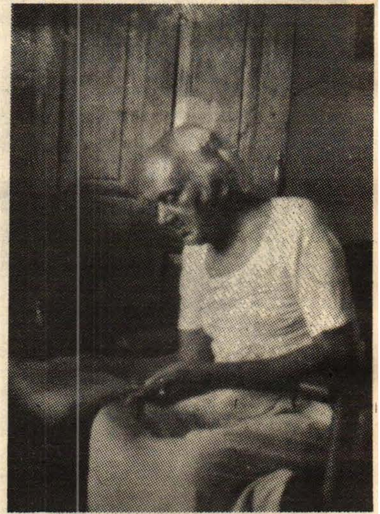

কবি নিবিষ্ট মনে কাগজ দেখছেন - -হয়তবা পড়ছেনও

www.pathagar.com

আমার কিছু কথা

বাংলাভাষায় 'অনুপ্রেরণা' কথাটি একটি মূল্যবান দায়িত্ব পালন করে আসছে, আমাদের বাংলাভাষীদের মনে। শুধু তাই নয়, 'অনুপ্রেরণা' যার মধ্যে বা যে ব্যক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না সে ব্যক্তি কখনো বড় হতে পেরেছেন তা আমার জানা নেই। 'অনুপ্রেরণা' না থাকলে কেউ বড় হতে পারেনা। অনুপ্রেরণার বলেই একজন অপর একজন সম্পর্কে জানার আকুলতাকে বাড়িয়ে তোলে। এবং এই অনুপ্রেরণা আছে বলেই ভালো কিম্বা মন্দ সবকিছুই জানার একটা আগ্রহ সবার মাঝে লক্ষ্য করা যায় এবং যার ফলে আজ বিশ্বের যে কোন স্থানের একটা ঘটনাকে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখতে সাহায্য করছে এই অনুপ্রেরণা। এবং যার জন্য আমরা বড় হতে পারছি, জানতে পারছি, কৌতূহলী হতে পারছি। মানুষের মাঝে এই অনুপ্রেরণা তখন থেকেই দেখা দেয় যখন তার ভাল কিম্বা মন্দ বুঝবার শক্তি কিম্বা মানসিকতা গড়ে ওঠে। এবং এই বুঝবার মানসিকতা গড়ে ওঠে তখনই যখন আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, পড়তে পারি, একে অপরের কাছে আবৃত্তি করে বলতে পারি "ভোর হ'ল দোর খোল খুকুমনি ওঠরে, ঐ ডাকে জুঁই শাখে ফুলখুকী ছোটরে। রবিমামা দেয় হামা গায় রাঙা জামা ঐ, দারোয়ান গায় গান শোন ঐ রামা হৈ" কিম্বা "আমি হব সকাল বেলার পাখী, সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি জাগি"। ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সাথে অনুপ্রেরণার জগত আরো বিস্তৃত হয়। সেই সঙ্গে কবিতা শেখার কবিকে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। এক সময় নামটি গেঁথে গেল হৃদয়ের নিভৃতে— কোনদিন মুছবার নয় সে নাম আমাদের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর নাম প্রতিটি বাংলাভাষীর হৃদয়ের নিভৃত কোণে চিরদিনের মত বাসা বেঁধে রয়েছে। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, কাব্য এবং অগণিত সঙ্গীতের এই মহান সম্রাটকে জানার বাসনা ছিল আমার প্রবল। কিন্তু আগ্রহ প্রবল হওয়া সত্বেও নজরুলকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে জানতে পারলাম কবি ঢাকায় আসছেন। উল্লেখ্য, তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কোলকাতা সফরকালে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে পূর্ব থেকে প্রোগ্রাম হওয়া সত্বেও

www.pathagar.com

আকস্মিকভাবে তা বাতিল করে দেয়া হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ দুটি ফুলের তোড়া তিনি পাঠিয়ে ছিলেন কবির সি, আই, টি রোডস্থ বাসভবনে। তিনি তাঁর নিজের দেশে কবিকে নিয়ে এসেই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেবেন বলে জানানো হয়েছিল। কবিপুত্রদ্বয় কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম কোলকাতায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সস্ত্রীক দেখা করেছিলেন এবং ফেব্রুয়ারী '৭২-এর তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে ঢাকায় এসে কবিপুত্রদ্বয় তাদের বাবার জন্য ধানমণ্ডির ৩৩০বি বাড়িটি পছন্দ করে যান। ধানমণ্ডির ২৮নং রোডের বাড়িটি পছন্দ করার সময় তাঁদের সাথে প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী ফিরোজা বেগমও ছিলেন। যা হোক নজরুলকে আমাদের মাঝে পাব এবং তাকে দেখার এতদিনের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারব জানতে পেরে আমার মন উতলা হয়েছিল। আনন্দ যেন আর ধরে না। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম কবির আগমনের তারিখ। কবির জন্যে ধানমণ্ডির আবাসিক এলাকার ২৮নং সড়কের ৩৩০ বি বাড়িটি প্রদান করেছেন সরকার। কবি যতদিন বাংলাদেশে থাকবেন ততদিন এ বাড়িতে থাকবেন। বাড়িটি একটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি। নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে কবি থাকবেন বলে। আসবাবপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, ফ্রিজ, গ্যাস, ফোন, সোফা সবকিছুই দেয়া হয়েছিল। কবির যাতে কোনরূপ অসুবিধে না হয় সে জন্য। কবি থাকবেন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে। বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হত কবির সম্মানে। এ সমস্তই জানতে পারলাম। তারপর একদিন কবি এলেন তার ৭৩তম জন্মদিনের একদিন আগে। অর্থাৎ ২৪শে মে ১৯৭২, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, ১০ রবিউস সানি ১৩৯২ সালে বুধবার বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকার ফ্রেণ্ডশীপের স্পেশাল ফ্লাইটে করে সকাল ১১-৪৫ মিনিটে।

কবি এলেন। পরদিন জন্মদিন। একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্বেও জন্মদিনে তাকে গান শোনাতে পারিনি। ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩রা জুন অবশেষে গান শোনালাম। প্রতিদিনের মত সেদিনও কবিকে দেখতে গয়েছিলাম, লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। ঐ দিন কেউ হারমোনিয়ামের পাশে যায়নি বলে কবির মেজাজ ভালো ছিল না। অগত্যা স্বেচ্ছাসেবকদের একজন এসে জানাল, কেউ গান জানলে এসে গাইলে কবি খুশী হবেন। এরপর থেকে শুরু হল কবিকে গান শোনাবার পালা। কিছুতেই বাসায় থাকতে পারতাম না। চলে যেতাম কবির পাশে। কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেয়ার অনুপ্রেরণায় একদিন স্বীকৃতি পেলাম কবি পরিবার থেকে। বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, তদানিন্তন বাংলাদেশের প্রেসিডেণ্ট; রোববার ১২ই নভেম্বর ৭২-এর সকালে ঈদ মুবারক জানাতে এলেন কবিকে সস্ত্রীক। ঐ সময়

www.pathagar.com

কবির নাত্‌নীদ্বয় কে নিয়ে আমি প্রেসিডেণ্টকে দুটো গান শোনালাম। এখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা শুরু হল এবং খিলখিল, মিষ্টির সঙ্গীতের সহযোগিতা তথা তালিম দেয়া শুরু হয়। এই আসরে তবলায় ছিলেন রেডিও বাংলাদেশ থেকে নিযুক্ত তবলচী শ্রী পারিতোষ কুমার সাহা। কবিভবনে নিযুক্ত এই পরিতোষকে সব সময় তবলা বাজিয়ে কবিকে আনন্দ দিতে দেখেছি। রেডিও থেকে শুধু 'ভিজিটর ডে'তে ওর প্রতি তবলা বাজানোর নির্দেশ ছিল। কিন্তু ওর নিজস্ব ইচ্ছের জন্য কবির পাশে প্রায়ই পাওয়া যেত। সে যাই হোক ঐ দিনই আমন্ত্রণ এসেছিল কবি পুত্রবধূ উমা কাজী (পরে রিজিয়া বেগম) এবং কবির ছোট ভাইর ছেলে কাজী মাযহার হোসেনের তরফ থেকে আমার কাছে কবির নাতি-নাত্‌নীদের মানে খিলখিল, মিস্টি-বাবুল (বাপী) কাজীর গান ও লেখাপড়ার দায়িত্ব বহনের এবং কবি নজরুল সম্পর্কিত কার্যাবলীর তদারকীর অনুরোধ আসে। যে কবিকে দেখতে পাব কিনা তাই ছিল অনিশ্চিত আর তারই পারিবারিক সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর চলে আসাতে কবির প্রতি আমার ভক্তি অনুরাগেরই জয় হয়েছে বলতে হয়। কবির প্রতি আমার গভীর ভক্তির ফলে আমার মধ্যে যে অনুপ্রেরণা তাঁকে সেবার ও তাঁর শেষ সময়ের অনেক কিছু জানবার সুযোগ এসেছিল। এ কাজের বিনিময়ে কোন পয়সা ছিল না। ছিল একটি ইতিহাসকে জানার অলৌকিক সুযোগ।

কবি গানের পাগল ছিলেন কিন্তু তাঁকে অনেক সময় গান ছাড়া থাকতে হ'ত। কোন শিল্পী তাঁকে প্রত্যহ নিয়ম করে গান শোনাতে পারতেন না। কলকাতা তো নয়ই, বাংলাদেশে আসার পরও প্রাথমিক আবেগ কেটে যাবার পরও কয়েকটা দিনের ব্যবধানে কোন শিল্পীকে দেখতে পেতাম না কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিতে। আমি কবিকে সে আনন্দ দিতে পেরেছিলাম। যে কদিন তাঁকে পেয়েছিলাম সকাল সন্ধ্যা নিয়ম করে গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলাম। এতে কবির প্রাণচাঞ্চল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ঢাকায় কবি এলেন

১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, ১০ই রবিউস সানি ১৩৯২, ২৪শে মে ১৯৭২ বুধবার কবি নজরুল ঢাকায় এলেন। ইতিপূর্বে জানা গিয়েছিল ২৩শে মে মঙ্গলবার কবি আসছেন। যথাসময় ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। ৩১ বছর পর কবি আবার ঢাকায় আসছেন। যে রকম জন-সমাগম কিম্বা একজন গণ্যমান্য অতিথি আসার পূর্বে বিমান বন্দরে যে রকম সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেয়া হয় তার কোন ব্যবস্থা ২৩শে মে মঙ্গলবারে দেখতে না পেয়ে বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে জানতে

www.pathagar.com

পারলাম কবি পরদিন অর্থাৎ ২৪শে মে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফকার স্পেশ্যালে আসছেন। ফিরে এলাম। ২৪শে মে সময়ানুযায়ী বিমান বন্দর গিয়ে পৌঁছিলাম আমরা ক'ভাই। জনসমাগম দেখে মনে হল কবি নিশ্চয়ই আসছেন। কবি আমাদের মাঝে কতটা প্রিয় তা ঐ দিন বিমান বন্দরে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাই উপলব্ধি করেছেন। বিমান বন্দরের টারমিনাল ভবনটির ছাদ এবং আশেপাশে তিল ধারণের যায়গা ছিল না। অবশেষে জনতা কবিকে এক নজর দেখার জন্য বিমান বন্দরের কড়া প্রহরা উপেক্ষা করে 'রানওয়ে'তে গিয়ে উপস্থিত হয়। কারো হাতে মালা, কারো গলায় ঝুলছে ক্যামেরা, কারো হাতে ফুলের তোড়া। ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে রইল কি? কিম্বা বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়নি তো? মাত্র ৪৫ মিনিটের পথ—তবে এত সময় লাগছে কেন? এমনি কত রকম গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। এই গুঞ্জনের এলোমেলোকে স্তব্ধ করে দিল ছোট্ট একটি ঘোষণা—অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ বিমানের একটি স্পেশ্যাল ফকার ফ্রেণ্ডশীপে করে আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখানে এসে পৌঁছুচ্ছেন। ঘোষণা শেষ হতে না হতেই সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ-ওই-ওইতো দেখা যাচ্ছে। একটা বিমান—কবি আসছেন। হ্যা, সবাই, 'রানওয়ে'তে যার যার স্থান ঠিক করে নিলেন। বিমানটি 'রানওয়ে' দিয়ে আস্তে আস্তে করে এসে একটু দূরে দাঁড়াল। সবাই ছুটল বিমান-টিকে ঘিরে ফেলবে যেন—ঘিরে ফেললও তারা। বিমানটির দরজা খুলল। সবাই একভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে—এয়ার হোস্টেস দরজা খুলে বলে উঠল, ভুল করেছেন আপনারা, এ বিমানটি সিলেট থেকে এসেছে। সবাই বিষণ্ন হয়ে আকাশের দিকে আবার তাকাতে লাগল। এ রকমটা হ'তন যদি বিমান বন্দরের ঘোষণা সবাই সম্পূর্ণ বুঝতেন। ঘোষণা ঠিকই হয়েছে—কিন্তু জনসমাগমের অধীর আগ্রহ এবং গুঞ্জন তাদের সেদিকের কর্ণপাত বাতিল করে দিয়েছে। হঠাৎ আরো একটা বিমান দূরের আকাশে দেখা গেল। হ্যাঁ, ওই-ওই-এটা নিশ্চয়ই। কেউ অতীব নিশ্চয়তার মধ্যেই বলে ফেলল হ্যাঁ, ওটাতেই আসছেন। কেউ বা একেবারে বিফল মনোরথ হয়ে কিছু বলছে না। বিমান বন্দর থেকে ঘোষণা হল আপনারা এরকম ছুটাছুটি করলে বিমান নামতে পারবে না। বিমানের পাইলটও কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ছিল এত জনসমাগমে কি করে বিমান নামবে। 'রানওয়ে'ই তো নেই।—শুধু মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। অবশেষে সিকিউরিটি ফোর্স কোনরকমে 'রানওয়ে' থেকে জনতাকে সরিয়ে দিল বিমানটির নামবার জন্য। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ বিমানের বিমানটি এসে কোনরকমে দাঁড়াল, ঘড়িতে তখন বেলা পৌনে বারটা।

www.pathagar.com

বিমান এসে দাঁড়াতেই সিকিউরিটি ফোর্সকে তোয়াক্কা না করে বিমানটিকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। গণ্যমান্য সরকারী প্রতিনিধি যারা কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন তাঁরা পিছনে পড়ে রইলেন। বিমানের দরজা খুলেই হোস্টেসরা বেসামাল হ'য়ে পড়ল। কি করে এর মাঝে অসুস্থ কবি নামবেন? হুইল চেয়ার, গাড়ী সমস্তই ঠিক ছিল। কিন্তু এর মাঝে কবি নামলে----নাহ্ কি করা যায়? অবশেষে তদানীন্তন ছাত্র নেতা আ. স. ম. আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং কোলকাতা থেকে আগত কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সব্যসাচীকেও এদের সাথে মাইকে বলতে বাধ্য করলাম, যাদের সহায়তায় কবিকে দ্রুত বিমান থেকে এ্যম্বুলেন্সে তুলে ধানমণ্ডির কবিভবনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। রব-মাখন মাইকযোগে বিমানের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন কবি এক্ষণি নেমে আসবেন এ দরজা দিয়ে—কবি অসুস্থ। আপনারা ধৈর্য-ধরুন। আপনাদের এলোমেলো ছুটোছুটি কবির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এদের কথায় সবাই বিমানের পেছনের দরজায় ভীড় করতে লাগল। বিমানের সামনের দরজাতেও ভীড় ছিল কিন্তু তুলনামূলকভাবে তা ছিল কম। আমরা যারা এতটা ভীড়ে অগ্রসর হতে পারিনি তারা কিন্তু সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে অনায়াসে দুটো দরজার কার্যকলাপ ঠিকই দেখতে পারছিলাম। যার ফলে কবিকে ধরাধরি করে বিমান থেকে এ্যম্বু-লেন্সে তোলার দৃশ্যটি ভালো করে দেখছিলাম। কবির সাথে এ্যম্বুলেন্সে কবি পরিবারের সদস্যদেরও উঠতে দেখা গেল। এ্যাম্বুলেন্সটি ধানমণ্ডির ২৮নং রোডের ৩৩০-বি বাড়ির উদ্দেশ্যে বিমান বন্দর ত্যাগ করল। সেদিনের বিমান বন্দরে প্রায় লক্ষাধিক জনতা ভীড় করেছিল।

বাংলাদেশে কবি এলেন ৩১ বছর পর। তাঁর শেষ আগমন হয়েছিল ১৯৪১। এর আগেও কবি অনেকবার এদেশে এসেছেন। এটা তাঁর প্রিয় "ও আমার বাংলাদেশের মাটি"। যে দেশের মাটিতে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর অমূল্য স্মৃতির অংশ। উল্লেখ্য কবি যখন এসেছিলেন তখন এ দেশটা ছিল উপমহাদেশেরই একটা অঙ্গ। এরপর উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান এবং ভারত নামে অভিহিত হয়। এ অঞ্চল পরিচিত হল পূর্ব-পাকিস্তান নামে। এরপর আবার বিভক্ত হল। এ অঞ্চলের পরিচিতি হল বাংলাদেশ নামে। যে নামটি কবি তাঁর কবিতায় বিভিন্নভাবে 'বাংলাদেশ' বলেই অভিহিত করেছেন। এবং দেরী করে হলেও কবির আগমনের দিন থেকে এক হাজার তিন শ' ছেষট্টি দিন পর অর্থাৎ ১৯৭৬ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ৫ই ফাল্গুন ১৩৮২, ১৭ই সফর ১৩৯৬ বুধবার, কবির মৃত্যুর মাত্র একশ' তিরানব্বই দিন পূর্বে ২৯ আগষ্ট ৭৬, ২ রমজান ১৩৯৬, ১২ ভাদ্র ১৩৮৩) কবিকে তাঁর প্রিয় সরকারীভাবে 'বাংলাদেশ'-এর নাগরিক বলে ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

কিছু তথ্যগত বক্তব্য এবং দায়িত্ব পালন

কবি নজরুল বাংলাদেশে এসেছিলেন কবির ৭৩তম জন্ম জয়ন্তীর আগের দিন। এবং কবি পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের হৃদ্যতা হয়েছিল এক মাসের মধ্যেই। এর কারণও অবশ্য ছিল, আমাদের বাড়িতে রয়েছে প্রচুর সংগ্রহ কবি নজরুলের। কবির প্রতি আমাদের পরিবারের অনুরাগ এবং ভক্তিও এর অন্যতম কারণ। সে যাক্ কবির সাথে কবির দুই পুত্রের পুরো পরিবারই ঢাকায় চলে এসেছিল। মাসখানেকের মত কবির ছোটপুত্র উপমহাদেশের প্রখ্যাত গীটার বাদক এবং নজরুলগীতির স্বরলিপিকার কাজী অনিরুদ্ধ (নিনি) তাঁর স্ত্রী নজরুল-গীতি শিল্পী কল্যাণী কাজী এবং তাঁদের দুই পুত্র এবং এক কন্যা সমেত ফিরে গেলেন কোলকাতায়। এখানে রইলেন কবির জ্যেষ্ঠপুত্র কাজী সব্যসাচী (সানি), স্ত্রী উমাকাজী এবং তাঁদের দুই কন্যা এবং এক পুত্র রয়ে গেলেন কবির সাথে ঢাকায়। প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী ডঃ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়ও এসেছিলেন তাঁর কন্যাসহ; তিনিও ফিরে গেলেন ওই একই সাথে। আর কবির সাথে রয়ে গেলেন কবির ছোটভাই মরহুম আলী হোসেনের পুত্র কাজী মাযহার হোসেন এবং কবির পালক কন্যার পুত্র শৈলেন এবং কবির কাজের জন্য শামসুদ্দিন দুলাল।

কবি নজরুলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী নাগাদ এবং ডক্টরেট প্রদান অনুষ্ঠান হয়েছিল ৯ই ডিসেম্বর ৭৪-এর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে। কিন্তু কবি নজরুলের ডক্টরেট প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা হয়েছিল ১৯৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারী। আমাদের সাথে ডক্টরেট প্রদান কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ শুরু হয়েছিল ৭৪-এর আগষ্ট—সেপ্টেম্বর থেকেই। কবি-ভবনে ৭৩-এর শেষ দিকের কয়েকটা দিন আমি ছিলাম না। এতে যদিও কোন অসুবিধা হয়নি তবুও কবির সঙ্গে এদের ডিগ্রী প্রদানকে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারিনি। কারণ স্ব স্ব পেশায় কৃতি পুরুষ হলেও ওরা নজরুলের সমতুল্য নন। অবশেষে ডক্টরেট গ্রহণ সংক্রান্ত পত্রটি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে কর্তৃপক্ষ তাদের দেয়া এ উপাধি কবি গ্রহণ করবেন কি-না এ নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। সে যাক্, দেরীতে হলেও কবির উপাধি গ্রহণ সংক্রান্ত পত্রটি পেয়ে তাদের সে চিন্তা দূর হয়েছিল। ঐ পত্রটিতে উমাকাজীকে শুধু সই করতে হয়েছিল—অভিমত, লেখা সব আমারই। এই পত্রে আমি কবিকে আলাদাভাবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডক্টরেট প্রদানের অনুরোধ করেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল

www.pathagar.com

মতিন চৌধুরী কবি নজরুল এই সম্মান গ্রহণ করেছেন দেখে যেভাবে উচ্ছাস প্রকাশ করেছিলেন তা মনে থাকবে চিরদিন। ডঃ চৌধুরী উল্লেখ করেছিলেন দিনটি তাঁর জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিন। আমার পুরো পত্রটা তিনি পড়লেন। বললেন—দুটো অনুষ্ঠান করার মত সময় নেই। কারণ ডক্টরেট প্রদান করবেন চ্যান্সেলর মানে দেশের প্রেসিডেণ্ট। তিনি ইতিমধ্যেই ঐ ৯ই ডিসেম্বর '৭৪-এর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তবু চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। কারণ আমার প্রস্তাবটা তাঁর কাছে ভাল লেগেছিল—যদিও ভিন্ন একটা অনুষ্ঠান করে কবিকে ডক্টরেট দেয়ার কথা ভাবেননি। বেশ কিছুদিন পরে আমাকে জানিয়েছিলেন ২৫শে জানুয়ারী '৭৫ সকালে কবিকে প্রেসিডেণ্ট ভবনে অর্থাৎ বঙ্গভবনে তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জনাব মোহাম্মদউল্লাহ্ সাহেব কবিকে ডক্টরেট প্রদান করবেন। তবে ৯ই ডিসেম্বর '৭৪ অন্যান্য যারা উপাধি পেয়েছিলেন তাদের সাথে কবির নামও উল্লেখ থাকবে। এরপর ২৫ জানুয়ারী '৭৫ কবি যখন বঙ্গভবনের সিঁড়িতে পা রাখলেন প্রেসিডেণ্টের গার্ডস বাহিনী "হ্যাটস অফ' করে কবিকে সম্মান জানিয়ে ছিল। প্রেসিডেণ্ট হিসেবে জনাব মোহাম্মদউল্লাহ্র ওটাই শেষ অনুষ্ঠান। আমাদের সামনেই কবিকে ডক্টরেট প্রদান করে তার চেয়ারে ফিরে গিয়ে ইস্তফা পত্র সই করেছিলেন এবং এরপরে কবিকে চা পানে আপ্যায়িত করেন। আমি এখানে উল্লেখ করছি কবির সাথে আর যাঁরা এ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তাদের নাম—প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু (মরণোত্তর) ডি. এস. সি., ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ডক্টর হীরেন্দ্রলাল দে, ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, প্রফেসর আবুল ফজল।

১৯৭৫ সালে কবির '৭৬তম জন্মজয়ন্তী হয়েছিল সম্পূর্ণ আমার দায়িত্বে। এই একটি মাত্র জন্মদিন কবির প্রথমবারের মত তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছাড়া হয়েছিল। আমার কাছে এ জন্য তারিখটির একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এর আগের জন্মদিন গুলোর পারিবারিক ও একটা নিয়মে কবির জন্মদিন পালিত হত তার ব্যতিক্রম করেছিলাম। আমি কোরআন তিলাওয়াত এবং কবির উপস্থিতিতে দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করেছিলাম। ঐ দিনই প্রথমবারের মত কবিকে টুপী পরিহিত অবস্থায় স্টেজে দেখা গিয়েছিল। এবং সকালের অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে করেছিলাম। কবির জন্য দোয়া মোনাজাত যে কক্ষে করার ব্যবস্থা করেছিলাম সে কক্ষে নেয়ার সময় পশ্চিম বঙ্গ থেকে আগত কবির সঙ্গীতের ছাত্রী শ্রীমতী রেণু ভৌমিক এসে তার ব্যাগ থেকে চন্দন গুঁড়োর প্যাকেট বেড় করে কবির

www.pathagar.com

কপালে প্রলেপ দেয়ার জন্য তৈরী হলে নিষেধ করেছিলাম। হয়তো তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু এছাড়া আমার কিছু করারও ছিল না।

কবি ভবনের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি যেমন কবি-স্ত্রী প্রমীলা নজরুলের মৃত্যু দিবস (৩০ জুন), কাজী অনিরুদ্ধর মৃত্যু দিবস (২২ ফেব্রুঃ) সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে মিলাদ-মাহফিল এবং কুরআন খতমের আয়োজন করতাম। এ সব অনুষ্ঠানের জন্য অতিথিবর্গকে দাওয়াতপত্র বিলি করার সময় অনেকের মুখ থেকে শুনতে পেতাম "শফি এদেরকে কি মুসলমান বানিয়ে ফেলবে"? কারণ ছিল দাওয়াতপত্র ছিল ইসলামী মতে।

৩১ অক্টোবর '৭৪ সালে এফিডেভিট করে উমাকাজী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম নেন রিজিয়া বেগম এবং ১৪ই ডিসেম্বর '৭৪ সালে অন্যত্র চলে যান। যাবার পর কবির দায়িত্ব পুরোপুরি আমার উপর এসে পড়ে। তদানীন্তন সরকারের সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী সাহেব কবির দায়িত্ব আমার হাতে দেন। কবিপুত্র সব্যসাচী লিখিতভাবে সরকারের কাছে কবির দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর '৭৪ থেকে ২২ জুলাই '৭৫ পর্যন্ত কবির স্বাস্থ্য দিন দিন ভালো হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে কবিবন্ধু খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, কবি আবদুল কাদির, কবি আজিজুর রহমান, সুফী জুলফিকার হায়দার, ব্যারিস্টার মোস্তফা কামাল (বর্তমানে বিচারপতি), জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের, ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম প্রমুখ কবির পাশে এসে কবির স্বাস্থ্য দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে কবি আজিজুর রহমান কবির স্বাস্থ্য দেখে আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে বলেই ফেললেন "শফি কি কবির যৌবন ফিরিয়ে আনবে নাকি?" এখানে উল্লেখ করতে হয় যে নজরুলগীতি শিল্পী বেদারউদ্দিন আহমেদ, সোহরাব হোসেন এবং কবি বে-নজির আহমদও কবির কাছে এসে খোঁজখবর রাখতেন।

১৯৭৪ সালের ২৪ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি হলে অনুষ্ঠিত আন্ত-র্জাতিক শিক্ষক সম্মেলনের নজরুলজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঐ অনুষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম সাহেব কবিকে ঐ অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত করতে এলে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমার একটা প্রস্তাব ঐ সভায় পেশ করার জন্য। কবির নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে ঐ সম্মেলন সরকারকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করছে বলে এই আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্মেলনের তরফ থেকে ঘোষণা হলে হয়তো এর একটা মূল্য নিশ্চয়ই হবে। অবশ্য এটাও ঠিক যে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে প্রস্তাব রাখাই যথেষ্ট নয়। অধ্যাপক সাহেব আমার অনুরোধ

www.pathagar.com

রক্ষা করে কবির উপস্থিতিতে ঘোষণা করেছিলেন "এই সম্মেলন সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে কবি নজরুলের সাহিত্যকর্মের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমাপ্ত করে নোবেল পুরস্কারের মনোনয়ন লাভের জন্য উক্ত কমিটির কাছে পেশ করতে।"

কবির জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি গাড়ী বরাদ্দ করেছিলেন। সরকারী পুল থেকে এ গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে। দুই গ্যালন করে তেল বরাদ্দ ছিল। প্রথম কয়েক মাস কিছু ভালো এবং খারাপ গাড়ী পাল্টানোর পর একটি ভাঙ্গা ভক্সওয়াগন গাড়ী নিয়মিত ছিল। তবে সেটাও বন্ধ করে দেয়া হল। এ ব্যাপারে মিষ্টি কাজীর সঙ্গে একবার পুল কর্তার কথা-কাটাকাটি হয়েছিল কেন গাড়ী নিয়মিত আসছে না। পুল কর্তার অভিযোগ কবি কি সব সময় গাড়ীতে চড়েন? মিষ্টি কাজীর জবাব ছিল: মাত্র দুই গ্যালন তেল এবং ভাঙ্গা গাড়ী দিয়ে হিসাব চাচ্ছেন? পুল থেকে আর যাদেরকে গাড়ী-তেল বরাদ্দ করেছেন—তাদের হিসাব নেন না? এর ফলে গাড়ী বন্ধ হয়ে গেল পুল থেকে। এরপর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটা মাইক্রোবাস কবিকে দেন—১৪ ডিসেম্বর '৭৪-এর পর তা-ও বন্ধ হয়ে যায়। কবি গাড়ীতে চড়তে খুব ভালবাসতেন সেটাও অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল।

কবি গাড়ীতে চড়তে ভালবাসতেন। একবার গাড়ীতে চড়লে আর নামতে চাইতেন না। মাঝে মধ্যে জোর করে নামানো হত। কবি গান শুনে যেমন খুশী হতেন গাড়ীতে চড়ে ততোধিক খুশী হতেন। কবির সঙ্গে একজন পুলিশ গার্ড এবং আমি থাকতাম। রুস্তম খাঁ বলে স্বাস্থ্যবিভাগের এক ড্রাইভার অনেকদিন কবির ডিউটিতে নিযুক্ত ছিলেন বলে তিনিই বেশীর ভাগ কবির সাথে গাড়ী ড্রাইভের সুযোগ পেয়েছেন। গুলশান লেকের পার, সেকেণ্ড ক্যাপিটাল, মীরপুর এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকাতেই বেশী বেড়ানো হতো। মাঝে মাঝে ক্যাণ্টনমেণ্টের ভেতর কবিকে নিয়ে গেলে সিপাই এবং অফিসাররা কবিকে যথেষ্ট সম্মান জানাতেন। একবার বাধ্য হয়ে পরদিন কবিকে নিয়ে সিপাই এবং অফিসারদের মাঝে পাঁচ মিনিট কবিকে রাখবার কথা দিতে হয়েছিল এবং তা রক্ষা করতেও হয়েছিল।

একবার কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের একজন পদস্থ কর্মচারী প্রসূন বাবু, এসেছিলেন কবি-ভবনে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। সাথে এসেছিলেন ঢাকা রেডিওর একজন পদস্থ কর্মচারী সৈয়দ শামসুল হুদা সাহেব। ভদ্রলোক কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবর নিলেন, কবিকে দেখে যথেষ্ট খুশীও হয়েছিলেন তিনি। এরপর কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে নজরুল-প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন রাখলাম—বলেছিলাম নজরুল-গীতির সপ্তাহে তিরিশ মিনিটের রেকর্ডের অনুরোধের আসরের ব্যবস্থা কেন

www.pathagar.com

করছেন না? চাহিদা তো প্রচুর। সপ্তাহে না হোক অন্তত মাসেও তো একবার তিরিশ মিনিটের নজরুল গীতির রেকর্ডের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতে পারেন? ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে আমার আর কি প্রশ্ন আছে করতে বললেন। প্রসঙ্গ টেনে বললাম কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে স্থানীয় মুসলিম কোন কণ্ঠশিল্পীর কণ্ঠ শোনা যায় না কেন? ও অঞ্চলের মুসলমানরা কি গান করেন না? ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন কোলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে আমার এ প্রশ্ন রাখবেন।

১৯৭৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী কবির দ্বিতীয়পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি ভবনে এক মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন অনেকের মধ্যে আমি নজরুলগীতির প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী অন্ধ জুলহাসউদ্দিন আহমেদকেও কার্ড দিয়েছিলাম। মাঝে মধ্যে শিল্পীর বাড়িতে যেতাম। কিন্তু এবার গেলে লক্ষ্য করলাম শিল্পীর গলায় অনেকটা ক্যান্সার জাতীয় হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে গাইতে পারবেন না বলেই স্থির করা হয়েছিল। তখনও গাইতে পারতেন না—কষ্ট হত। অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। তদানীন্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী সাহেবকে বললে তিনি একটা 'এপ্লিকেশন' করতে বলায় একসময় তাকে তা পেশ করলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অনেকের সাথে অন্ধশিল্পী জুলহাসউদ্দিন আহমদকেও পাঁচ হাজার টাকা এবং পিজি হাসপাতালের ওয়ার্ডে রেখে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। নজরুলের গান কণ্ঠে নিয়ে যারা প্রচার করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের কণ্ঠ যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অন্তত একটি কণ্ঠকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। এটাও এক ধরনের নজরুলকে সেবা করা বলেই আমি মনে করেছিলাম।

কবির কি করে সময় কাটতো—সকাল

কবি ঘুম থেকে উঠতেন খুব সকালে। ফজর ওয়াক্ত যেটাকে বলে সে সময়ে। কিন্তু কখনো বিছানা ছেড়ে উঠতেন না। শুয়ে শুয়ে মাথার নীচে হাত খানা রেখে চোখ মেলে থাকতেন। মশারী তুলতে গেলে পুরোপুরি মশারী তোলার আগেই তিনি শোয়া থেকে উঠবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু উঠতে পারতেন না, কারণ শরীরের ওপরে কম্বল দিয়ে ঢাকা থাকতো বলে। কম্বল উঠিয়ে নিলেই তিনি উঠে পড়তেন অবশ্য তাঁর হাত ধরে সাহায্য করতে হতো। দাঁড়াতেন, কিন্তু হেঁটে সরে যেতেন না, কাপড় পাল্টাবার জন্য অপেক্ষা করতেন। পায়খানা কিম্বা প্রস্রাবে কাপড় নষ্ট হয়ে আছে বলেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। যদি প্রস্রাব

www.pathagar.com

করে কাপড় নষ্ট অবস্থায় পাওয়া যেত তবে ওখানেই পাল্টানো হতো। কিন্তু পায়খানার বেলাতে তাঁকে গোসলখানায় নিয়ে যাওয়া হতো। নির্দেশ করলেই গোসলখানার দিকে পা' বাড়াতেন। পরিষ্কার করা হলে সর্বশরীরে পাউডার এবং মুখে স্নো কিম্বা ক্রীম লাগিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে দিলে, তিনি খুশী হতেন। ইতিমধ্যে বিছানা গোছানোও হয়ে যেত। তবে কবি হয় বিছানাতে নয় পাশে রাখা চেয়ার নিজে থেকে গিয়েই বসতেন। তারপর হরলিক্স চামচে দিয়ে খাইয়ে দেয়া হতো। এরপর কবিকে সকালের বাতাসের জন্য বারান্দায় নিয়ে আসা হত। ইঙ্গিত করলে তিনি ইঙ্গিত বরাবর চলে যেতে পারতেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন কবি ধানমণ্ডির বাড়িতে দোতলার সামনের ঘরে থাকতেন। বাংলাদেশে প্রথম যখন এসেছিলেন তখন কিছুদিন নীচের তলার পেছনের একটা ঘরে থাকতেন এবং কিছুদিন দোতলার মাঝখানের ঘরে থাকতেন। সে যাক্। বারান্দায় কিছুক্ষণ থাকার পর গান শোনাবার পালা। হারমোনিয়াম নিয়ে সকালের পর্বে প্রথম দিকে সাধারণত আমিই গান শোনাতাম। কবির বড় নাত্নী খিলখিল এবং মেজ নাত্নী মিষ্টিও গান শোনাতে চলে আসতো। রেডিও বাংলাদেশ থেকে কবি ভবনে নিয়োজিত তবলচী পরিতোষ কুমার সাহাও মাঝে মধ্যে কবিভবনে থেকে গেলে সকালে তবলা সঙ্গীতে আসতেন। সকাল সাড়ে আটটা কোন কোন দিন ন'টা পর্য্যন্ত কবিকে গান শোনান হত। এই গান শোনানোর মাঝেই কবিকে নাশ্‌তা দেয়া হতো হাতে তৈরী বেশ ভারী দু'খানা রুটি, দুধ-হরলিক্স, সেই সাথে কলা। নাশ্‌তার সঙ্গে আমের দিনে আম, কিম্বা আনারসের দিনে আনারস দেয়া হ'ত। তবে কলা অবশ্যই একটা কিম্বা দুটো থাকতো। চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়া হত। নাশ্‌তার পর কবিকে ভক্তদের মাঝে সময় কাটাতে হতো। হয়তো কক্ষে নয় বারান্দায় নয়তো নীচের তলার ড্রইং রুমে নয় 'লন'এ পায়চারী করা অবস্থায় কিম্বা ২৮নং সড়কের কবি ভবনের সামনের সামান্য কিছুটা পথ হাঁটা অবস্থায় ভক্তরা তাঁকে দেখতে পেতেন। কেউবা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে ফুল দিতেন, কেউবা মালা, কেউবা ফুলের তোড়া, কেউবা ফল নিয়ে আসতেন (কলা, আম, আনারস, কমলাই বেশী আনতেন ভক্তরা) কেউবা গান শুনিয়ে কবিকে আনন্দ দিতেন। কেউবা গান শোনালেও বলতেন আমাকে—কবি গান শুনলে কেমন করেন তা স্বচক্ষে দেখার জন্য গান শুনিয়ে তাদের সে তৃষ্ণা মিটাতে হত। সকালে ন'টা থেকে এগারটা পর্যন্ত কবি ভক্তদের সামনে থাকতেন। হয়তো গান শুনতে শুনতে কবি সারা কক্ষটা পায়চারী করতেন—কিম্বা কাৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেন বাঁ-হাতখানা মাথার নীচে রেখে। কিম্বা গান শুনতে শুনতে হারমোনিয়ামের উপর রাখা গানের খাতাটাকেই নিয়ে মাথার ওপাশে

www.pathagar.com

খাটের কিনারে ফেলে দিতেন। হয়তো মাঝে মাঝে আবার তুলেও নিতেন সে খাতা উঠে গিয়ে। খুশী হয়ে মাথা চুলকাতেন, নাকে হাত দিতেন, খুশী হলে তাঁকে মাথা চুলকোতে আর মুখে হাত বুলোতে দেখা যেত। ভক্তদের দিকে তাকাতেন, বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়তেন, হয়তো ধমকের মত করে একটা আওয়াজ করতেন, কিম্বা ইশারা করে শিল্পীকে আরো একটা গান করতে বলতেন। হয়তো অন্য একটা খাতা কিম্বা পত্রিকা, কিম্বা ছবির বই, কিম্বা গানের খাতা টেনে-জিভে আঙুল ভিজিয়ে শুধু ওল্টাতেন। কোন কোনদিন এসবের কোনটাই করতেন না। একমনে বসে থাকতেন। হয়তো চোখের কোণে পানি আসতো, কোন কোন দিন সে পানির মাত্রা বেশী হলে গড়িয়ে পড়তো কপোল বেয়ে। বেশী হাসলে পরই এ দৃশ্য দেখা যেত। হয়তো কোনদিন কোন ভক্তের অনুরোধে তাদের আনিত মিষ্টি চামচে করে সামান্য পরিমাণ খাওয়াতে হতো-তৃপ্তি পেতেন তারা কবি কিভাবে খেতেন তা দেখে। তবে কবির গলায় মালা দিলে কখনোই তা রাখতেন না গলায়—সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে নিজেই খুলে ফেলে দিতেন পাশে। এ ভাবেই তিনি সময় কাটাতেন সকালের। তবে শুধু সকালেই নয় কবিকে এমন করতে অন্যান্য সময়ও দেখা যেত। এগারটা বেজে গেলে কবিকে সাধারণত আর ভক্ত পরিবেষ্টিত দেখা যেত না। তাঁকে শুইয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হত। মাঝে মধ্যে নিজে থেকে একাকীই শুয়ে পড়তেন। নিজে শুয়ে পড়লে কাৎ হয়ে সাধারণত তিনি যেভাবে গা'এলিয়ে দিতেন বিছানায় সেভাবেই দিতেন। নইলে চিৎ করিয়ে শুইয়ে দেয়া হত। কম্বল দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হত। সাধারণত সকালে আটটার মধ্যেই গোসল করিয়ে দেয়া হত। এরপর মাথায় সুগন্ধী তেল দেয়া হত, উল্লেখ্য সুগন্ধী তেল-স্নো-পাউডার কবি পছন্দ করতেন-খুশী হতেন। সকালে গোসলের পর নাশ্‌তা দেয়া হত। হ্যাঁ, বিশ্রামের জন্য কম্বল গায়ে জড়ানো হলে আর তাঁকে বিরক্ত করা হত না। মাঝে মাঝে কোন ভক্ত মফস্বল থেকে এসে আব্দার করলে ঐ অবস্থায়ই দেখতে চাইলে খুব সন্তর্পণে কবিকে দেখাতাম, অবশ্য কবির যাতে বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য থাকত।

কবির কি করে সময় কাটতো—দুপুর

এ সময় কবিকে খুব একটা ব্যস্ত থাকতে হত না। বিশ্রাম' আর বিশ্রামেই তাঁর সময় কেটে যেত। বেলা ঠিক বারটা নাগাদ তাঁর খাওয়ার সময় নির্ধারিত হয়েছিল। এগারটার বিশ্রামের মাঝে তিনি সামান্য ঘুমোতেনও। তেমনটি হলে খাওয়ার পূর্বে তাঁকে জাগিয়ে নিয়ে খেতে দেয়া হত। তাঁর দুপরের খাওয়া হত সাধারণত গরু-খাসী-বাচ্চা মোরগের গোশ্‌তের যে কোন একটির স্যুপ জাতীয়

www.pathagar.com

রান্না দিয়ে। সেই সঙ্গে কাঁচা পেপে-গাজর-বীট-কাঁচকলা-সাথে অন্যান্য তরিতরকারী থাকতো যেমন ঢেড়শ, লাউ-পটল ইত্যাদি—ঝাল ছাড়া। পরিমাণ মতই খেতেন। চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়া হত। ভাত দেয়া হত পোলাও-এর চালের। গোশ্‌ত ছাড়া অন্যান্য মাছ্‌ও দেয়া হতো মাঝে মধ্যে। মাছের মধ্যে সাধারণত রুই-শিং-মাগুর-কই এবং মাঝে মধ্যে ইলিশও দেয়া হত। যাই প্রস্তুত হত না কেন ভাত এবং তরকারী একত্র মিশিয়ে দেয়া হত যাতে কবির খেতে কোন অসুবিধে না হয়। কারণ কবির মাড়ীতে কোন দাঁত ছিল না। সবসমেত গোটা পাঁচেক দাঁত ছিল কবির। দুপরের খাওয়ার পর আবার বিশ্রামে যেতেন। বিশ্রাম মানে ঘুমিয়ে পড়তেন। বেশ নাক ডাকিয়েই ঘুমোতেন। বেলা তিনটার দিকে একবার তাঁর কাছে যাওয়া হত। প্রস্রাব কিম্বা পায়খানা করে থাকলে পরিষ্কার করে দেবার জন্য। এ সময়টায় কবিকে ঘুম থেকে তোলা হলে দেখা যেত তাঁর ঘুমের ঘোর কাটছে না। এর মধ্যেই তাঁকে পরিষ্কার করে পাউডার ইত্যাদি লাগিয়ে আবার শুইয়ে দিলে ঘুমিয়ে পড়তেন। এবং বেলা চারটা সোয়া চারটার দিকে তাঁকে গিয়ে তোলা হতো কিম্বা মাঝে মধ্যে নিজেই জেগে উঠতেন এবং যদি একাকী জেগে উঠতেন তবে তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতেন, আমাদের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত সেভাবেই শুয়ে থাকতেন।

কবির কি করে সময় কাটতো—বিকাল

বিকেলেও কবিকে অনেকটা সকালের মত করেই সময় কাটাতে হত। সাড়ে চারটার দিকে বিকেলের নাশ্‌তা দেয়া হত। এর আগে কবিকে ভক্তদের মাঝে পরিবেষ্টিত হয়ে সময় কাটাবার জন্য প্রস্রাবের জামা কাপড় পরিষ্কার করিয়ে দেয়া হত। এরপর বিকেলের নাশ্‌তা দেয়া হত। এক লিটারের এক প্যাকেট দুধের তৈরী ছানা-যা লেবু দিয়ে জ্বাল দিয়ে তৈরী করা হত। সেই ছানার সাথে একটা কলা কিম্বা আনারসের টুকরো, কিম্বা আমের দিনে হলে একটি বা পরিমাণ মত আম (সাধারণত রাজশাহী অঞ্চলের ফজলী আমই বেশী দেয়া হত) দিয়ে ছানা মিশিয়ে চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়া হত। এরপর অপেক্ষমান ভক্তরা কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে আসতেন। মালা, ফুলের তোড়া, মিষ্টি, ফল নিয়ে আসতেন ভক্তরা। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গানও শোনাতেন কবিকে। এমনি ভক্তদের দ্বারা কবি পরিবেষ্টিত থাকতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। খুব বেশী গান-জানা ভক্ত সাধারণত দেখা যেতনা তবে আমাকে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেই হতো কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিতে এবং ভক্তরা আনন্দ পেতেন, কবি গান শুনে কেমন করেন

www.pathagar.com

তাই দেখে। খিলখিল প্রায়ই এবং মাঝেমধ্যে মিষ্টি এবং উমা কাজীও কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিতে আমার পাশে এসে বসতেন। বিকেলেও কবি পায়চারী করতে ভালবাসতেন। এবং পায়চারী তে৷ করতেনই সেই সাথে যতদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কবির জন্য গাড়ী বরাদ্দ ছিল ততদিন পর্যন্ত গাড়ীতে করেও বেড়াতেন। গাড়ী চড়তে কবি খুব বেশী ভালবাসতেন। এবং গাড়ী যখন ছিল না। তখন থেকেই পায়চারীর অভ্যেসটা রীতিমত কবি করে নিয়েছিলেন। শীতের সময় কবি পায়চারী করতেন কবি ভবনের সবুজ ঘাসের লনের উপর। বৃষ্টিবাদলের সময় পাকা করা স্থানটুকুতেই পায়চারী করতেন। খারাপ আবহাওয়ায় কবিকে সাধারণত নীচের তলায় নামানো হত না। দোতলার বারান্দায় চেয়ার পেতে দেয়া হত। কবির পাশে একটা টুল রেখে ছবির বই, কাগজ ইত্যাদি রাখা হত; উল্লেখ্য কবি ছবির বই বিশেষ করে রঙিন ছবির বই বেশী পছন্দ করতেন। কবি একটার পর একটা বই-এর পাতা উল্টাতেন এবং নীচে ফেলতেন। বইগুলো তুলে দিলে আবার হাতে নিয়ে জিভে আঙুল ভিজিয়ে পাতা উল্টাতেন আর ভক্তদের পানে কিম্বা এদিক ওদিক তাকাতেন। মাঝে মধ্যে ভক্তদের সামনে তাদের অলক্ষ্যেই প্রস্রাব কিম্বা পায়খানা করে ফেলতেন, সে অবস্থায় ভক্তদের সরিয়ে দিয়ে কবিকে পরিষ্কার করে আবার ভক্তদের কাছে নিয়ে আসা হত। এমনি ভাবেই কেটে যেত কবির সন্ধ্যে পর্যন্ত সময়টা। ভক্তদের ভিড় বেশী হলে সন্ধ্যের পর পর্যন্তও কবি ভক্তদের কাছে থাকতেন। সকালের থেকে বিকেলের সময়টাতে ভক্তদের সংখ্যা বেশী হত। সন্ধ্যের পর কবিকে আবার পোশাক পাল্টিয়ে শুইয়ে দেয়া হত বিশ্রামের জন্য। কবি প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিতেন। কবি কিন্তু এ সময়-টাতে ঘুমোতেন না। শুয়ে শুয়ে বিশ্রামই করতেন। হয়তো তন্দ্রা যেতেন কদাচিৎ। এভাবেই কবি বিকাল এবং সন্ধ্যে কাটাতেন।

কবির কি করে সময় কাটতো–রাত

সন্ধ্যের বিশ্রাম কাটিয়ে কবি প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ উঠে পড়তেন। নিয়ে আসা হতো টেলিভিশন কক্ষে। সোফায় বসে একমনে তিনি টেলিভিশন দেখতেন। শীতের সময় ছাড়া এ সময় তিনি বেশীর ভাগ গেঞ্জি প'রে থাকতেন। খালি গায় কবিকে কখনোই রাখা হত না—কবি সুস্থ অবস্থায়ও কখনো খালি গা' দেখাতেন না। শীতের সময় একটা ফুলহাতা পুলওভার গায়ে দেয়া হত। টেলি-ভিশন যেভাবে কবি উপভোগ করতেন তা সত্যিই লক্ষ্যণীয় ছিল। এ সময় কোন-রূপ বিরক্তি তিনি পছন্দ করতেন না। লাইট জ্বেলে রাখতে হতো কবির

www.pathagar.com

টেলিভিশন দেখার সময়। অন্ধকারে বসে কবি টেলিভিশন দেখার সময় বারে বারে উঠবার ভঙ্গি করতেন বরং তাঁর বিরক্তির ভাবও ফুটে উঠতো। কবি এমনিতেও অন্ধকারের ভয় পেতেন বা পছন্দও করতেন না। টেলিভিশন দেখতে দেখতে কবি মাঝে মধ্যে এতই মনযোগী হতেন যে সামান্য ছোঁয়াতে পর্যন্ত চমকে উঠতেন। এবং যেদিক থেকে তাঁকে ছোঁয়া হত সেদিকের কারও প্রতি একনজরে প্রায় মিনিট খানেক তাকিয়ে আবার টেলিভিশনে মন দিতেন। কবির চোখে ক্যাটারান বা ছানি যদিও লক্ষ্য করা হয়েছিল তথাপি কবির চলাফেরায় কোন অসুবিধে কখনোই লক্ষ্য করা যায়নি। সে যাক্, সাধারণত আমিই তাঁকে সোফার কোণে বসিয়ে তাঁর বাম পাশটিতে বসতাম এবং এ রকম সামান্য স্পর্শ করে অনেক ধমক খেয়েছি। মাঝে মধ্যে টেলিভিশন দেখার সময় হলে তাঁকে নিয়ে আসতাম না। কিন্তু দেখা যেত একা একা কবি চলে এসেছেন টেলিভিশন কক্ষে। তখন প্রচুর আনন্দ পেতাম। এমনি ভাল লাগত তাঁর টেলিভিশন দেখতে। টেলিভিশন দেখার সময় কবিকে চা-পানের অভ্যেস করিয়েছিলাম। এই চা-এর অভ্যেসটা বলতে গেলে আমিই কবিকে করিয়েছিলাম। পুরো এক কাপ চা পান করতেন, তশতরীতে ঢেলে খেতে ভালবাসতেন। কাপে খেতে পছন্দ করতেন না। মাঝে মধ্যে আবার তশতরীতে ঢেলে দিলে নিজ হাতে তুলে পান করতেন। চা-এর অভ্যেসটা যে ভাবে হয়ে উঠেছিল এবং কবি যে ভাবে আগ্রহ দেখাতেন তাতে তাঁর ভাল অবস্থায় চা-এর গল্প মনে পড়ে। কবির টেলিভিশন দেখার অভ্যেসটা একান্তভাবে আমার প্রচেষ্টায় হয়েছিল এবং তাঁর স্বাস্থ্য এ সময় উল্লেখযোগ্য ভাবে ভাল হয়ে উঠেছিল। তাঁর অসুস্থ অবস্থার চৌত্রিশ বছরে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার কারণ ছিল আমাদের নিবিড় শুশ্রূষা এবং এই ছোট ছোট আনন্দগুলো। উল্লেখ করতে হয় এবং প্রয়োজন না হলে রাত ৮–৯টার দিকে কবির সামনে হারমোনিয়ম নিয়ে বসা হত না কারণ এতে তাঁর টেলিভিশন দেখা হয়ে উঠত না। টেলিভিশন সাধারণত রাত ৯টা পর্যন্ত দেখতেন কবি। মাঝে মধ্যে রাত ৯টার পরও হত। টেলিভিশন দেখা হলে কবিকে তাঁর রুমে নিয়ে আসা হত এবং রাতের খাওয়া খেয়ে নিতেন। তবে যেদিন টেলিভিশন দেখতে দেখতে রাত ৯টা বেজে যেত সেদিন টেলিভিশনের সামনে খেয়ে নিতেন। রাতের খাবার দেয়া হত কবিকে তিনখানা ভারী রুটি এবং সেই সঙ্গে গরু-খাসী-বাচ্চা মোরগের যে কোন একটির গোশ্‌ত কিম্বা মাছের মধ্যে ইলিশ রুই-শিং-কৈ-মাগুর এর যে কোন একটি মাছ। সেই সাথে বীট-গাজর-পটল-ঢেঁড়স, কাঁচা পেপে, কাঁচ কলা ইত্যাদি তরকারীর ঝালছাড়া স্যুপ একত্র মিশিয়ে চামচে ক'রে খাইয়ে দেয়া হত। খাওয়ার পর এক গ্লাস পানি খেতেন—দুপুরে কিম্বা রাতে যে কোন সময়ই খাওয়ার পর পানি

www.pathagar.com

খেতে পছন্দ করতেন। মাঝে মধ্যে গ্লাস নিজে তুলে নিতেন। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রাতের ঘুমের জন্য বিছানায় গা এলাতেন। তাঁকে শুইয়ে দিলে মশারী ফেলে 'ফ্যান' ছেড়ে দেয়া হত। ফ্যানের স্পীড আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দেয়া হত। সব সময় একটা 'ডিম' লাইট জ্বেলে রাখা হত রাতে তাঁর রুমে। কারণ কবি অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করতেন না। রাত তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে একবার তাঁর রুমে গিয়ে তাঁকে পরিষ্কার করে দেয়া হত, এ সময়তে সাধারণত তিনি প্রস্রাব করতেন। এবং কাপড় পাল্টানোর সময় বলতে গেলে তিনি ঘুমিয়েই থাকতেন, কাপড় পাল্টানো হলে শুইয়ে দিলে ঘুমিয়ে পরতেন। বেশ শান্তিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। কবি খুব জোরেশোরেই নাক ডাকতেন। কবির নাক ডাকা শুনলে মনে হতো তাঁর ঘুম খুব ভালই হত। এ ভাবেই কেটে যেত কবির রাতের সময়।

কবির কি করে সময় কাটতো—অন্যান্য

এ অনুচ্ছেদে আমি কবির গোসল করা, পরিপাটি, বিছানা-বালিশ, পাউডার-স্নো ব্যবহার, কাগজ ছেঁড়া, খাটের মাথার পাশে ব্যাঙ্ক তৈরী করা পসঙ্গে আলোকপাত করব। প্রথমেই কবির গোসল এবং কাপড় পাল্টানো প্রসঙ্গে বলব। কবিকে প্রত্যহই গোসল করানো হত এবং তা সকাল আটটার দিকে। কিন্তু ইতিপূর্বে কবির সঙ্গে যখন আত্মীয়রা থাকতেন তখন দিনে দু'তিনবারও গোসল করানো হতো। আমার কাছে তা ভাল না লাগাতে একবারই আমি দিনে গোসল করাতাম। একটা টার্কিশ তোয়ালে জড়িয়ে তাঁকে বাথরুমে নেয়া হত। একটা ছোট্ট টুলের উপর বসিয়ে তাঁর শরীরে পানি ঢালা হত। পানি ঢালার সময় কবি বিশেষ করে ডান হাত দিয়ে মাথার পানি সরাতেন এবং সুস্থ মানুষের মত নাক-মুখে হাত ব্যবহার করতেন। সাবান মাখা হতো। গোসলের পর তোয়ালে খুলে মুছে দেয়ার সময় তিনি লজ্জা পেতেন এবং হাত দিয়ে বাধা দিতেন। নতুন কারো সামনে কবি বিশেষভাবে লজ্জা পেতেন। শরীর মুছে দেয়ার পর তোয়ালে না জড়ালে তাঁকে বাথরুম থেকে বাইরে নিয়ে আসা যেত না। যে পর্যন্ত তোয়ালে না জড়ানো হত সে পর্যন্ত তিনি পা বাড়াতেন না এবং তোয়ালে জড়ানো হলে নিজেই বাথরুম থেকে বেড়িয়ে আসতেন। কবি খুব সাবধানী ছিলেন। বাথরুমের সামান্য পিছল স্থানে খুব সাবধানে পা বাড়াতেন যাতে পিছলে না পড়েন, আমরা তাঁকে ধরলেও সে সময় তিনি নিজেও হাত বাড়িয়ে দেয়াল কিম্বা দরজার হুক যা পেতেন তাই ধরে এগোতেন। এরকমটা কবিকে অন্য সময়ও লক্ষ্য করা যেত যেমন

www.pathagar.com

সিঁড়ি দিয়ে যখন তিনি নামতেন কিম্বা উপরের তলায় উঠতেন সে সময় আমরা তাঁকে ভালভাবে ধরে নিলেও নিজে হাত দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত রেলিং না ধরতে পারছেন সে পর্যন্ত পা বাড়াতেন না। আমাদের তাঁর প্রতি সাবধানতা অবলম্বন থেকেও নিজের সাবধানতা অবলম্বনকে তিনি বেশী বিশ্বাস করতেন। সে যাক্। গোসলের পর মাথায় সুগন্ধি (জবা-কুসুম) তেল, এবং মুখে স্নো কিম্বা ক্রীম, পাউডার লাগালে কবিকে উৎফুল্ল মনে হতো। লুঙ্গী-জামা গেঞ্জী পরিয়ে দিলে নিজের রুমে নিজেই চলে আসতেন। কবিকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝালে বুঝতেন। যেমন গেঞ্জী পরাবার সময় তাঁর হাত দুটো গেঞ্জীর হাতের ভেতর দিলে নিজেই টেনে নিয়ে পরতেন। শীত লাগছে এটা তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না। তবে গরম লাগলে প্রকাশ করতেন। মাথার ওপর ফ্যানের দিকে বার বার তাকাতেন, ফ্যান ছেড়ে দিলে তাঁর ঐ তাকানো বন্ধ হত। জুতো মোজা পরাবার জন্য তাঁর পায়ের সামনে এনে রাখলে তিনি তাঁর পা বাড়িয়ে দিতেন। ডান পা আগে এগিয়ে দিতেন। মোজা পায়ে দিলে পর জুতোর মধ্যে পা দিতেন নিজে থেকেই, তবে পরতে পারতেন না। পরিয়ে দিতে হত। লুঙ্গী পরিয়ে গেরো দেয়া না হলে তিনি লুঙ্গী ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং লুঙ্গী পাল্টানোর সময় খুলে দিলে তিনি পা তুলে লুঙ্গী থেকে সরে আসতে পারতেন যা আগে পারতেন না। এসব একান্তভাবে আমার পরিপর্যার জন্যে সম্ভব হ'য়েছিল। নীচের তলা থেকে দোতলায় উঠে আসার সময় সাধারণত সে সময়তে আমি বাড়িতে থাকলে আমি থাকতাম নইলে অন্যরা থাকত। কবি ভবনের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানে একটা বাঁক রয়েছে—এরপর রয়েছে পাঁচটা সিঁড়ি, এই পাঁচটা সিঁড়ি ছেড়ে দিলে কবি একাই উঠে আসতে পারতেন। অবশ্য এ অভ্যেসের প্রথম দিকে কবির কষ্ট হতো এবং অনেকদিন লেগেছিল কবিকে এ অভ্যেস করাতে। পরে অবশ্য কবি খুব সহজেই উঠে আসতেন। ২২শে জুলাই ৭৫-এ কবিকে অনর্থক অসুস্থ বলে পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসার মিনিট দশেক আগেও এভাবে ওপরে চলে এসেছিলেন প্রতিদিনের মত। পরিপাটি বলতে যা বুঝায় কবির পক্ষ থেকে সেটা আশা করা যায় না কারণ এ অবস্থায় তাঁর পরিপাটি থাকার কথা নয়, তা নির্ভর করত যারা পরিচর্যা করত তাদের উপর। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিজে থেকে না হলেও তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই ছিলেন। যেমন মুখ ধোয়া কোনদিনই তাঁর হত না অসুস্থ হবার পর, কিন্তু সবে ঘুম থেকে ওঠা অবস্থায়ও তাঁর মুখ থেকে কোন রকম দুর্গন্ধই পাওয়া যেত না এবং সবে ঘুম থেকে ওঠার পরও কোন দিনই চোখের কোণে কোন পিচুটি দেখতে পাওয়া যেতনা। বলা বাহুল্য প্রচুর ঠাণ্ডাতেও তাঁর নাক অপরিষ্কার হত না। ১৯৭৪ সালের ১০ই মে দিবাগত রাতে

www.pathagar.com

তাঁর চোখে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর বাঁ চোখটি পুরো রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেই ঠাণ্ডা লাগা লাল চোখ নিয়েই টাঙ্গাইল ঘুরে এলেও তাঁর চোখে কখনো পিচুটি জমতে দেখা যায়নি। তাঁর বিছানায় দুটো বালিশ তিনি পছন্দ করতেন না। একটা তিনি ফেলে দিতেন খাটের মাথার ওপাশে। খাটের মাথার ওপাশটাকে আমি কবির 'ব্যাঙ্ক' বলতাম। কারণ সমস্ত কিছুই কবি ওখানটাতে ফেলতেন। মাঝে মধ্যে দেখা যেত শুধু বালিশই নয় তাঁর রুমের যাবতীয়-তাঁর জন্য রাখা বইপত্র, ফুলদানী সমস্তই ঐ 'ব্যাঙ্ক'-এ ফেলে রেখেছেন। ঘরে কাউকে না দেখে এরকম করতেন মাঝে মাঝে তবে পিজি হাসপাতালে যাওয়ার আগে থেকেই কবি দুটো বালিশই বিছানায় রাখতে পছন্দ করতে শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের ১লা জুন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরুর পর থেকেই এটা লক্ষ্য করা হয়েছিল। পাউডার-স্নো-ক্রিম-তেল, এর কোনটাই ব্যবহারে কবির আপত্তি কিম্বা আগ্রহ লক্ষ্য করা যেত না তবে এসব ব্যবহারে কবির চোখে হাসির ঝলক ফুটে উঠত এবং উৎফুল্লও লাগত। মাঝে মধ্যে রাত তিনটের দিকে কবির কাপড় পাল্টাতে গেলে দেখা যেত কবি তাঁর বাম হাত খানা যথারীতি মাথার নীচে রেখে ওপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কবির এ তাকানোটা সাধারণ তাকানোর থেকে অনেকটা ভিন্ন ছিল। এবং তাঁর রুমে কেউ যে প্রবেশ করেছে তা যেন তাঁর লক্ষ্যেই পড়েনি। তাঁর সে চাহনির মধ্যে যেন একটা অন্যরকম ভাব ছিল, চোখভরা সামান্য হাসির রেখা নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকতেন ওপরের দিকে। আমার মনে হতো তিনি যেন ধ্যান করতেন–কিছু চিন্তা করতেন। পাতলা মশারীর ভেতর দিয়ে বেশ লক্ষ্য করা যেত তিনি যেন ধ্যানের মহাসমুদ্রে ডুবে রয়েছেন। মশারী তোলা হলেও তার সে চিন্তা সে ধ্যানের একাগ্রতা ভাঙত না। এমনি তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর গায়ে হাত লাগলে যেন লক্ষ্য করতেন যে কেউ তাঁকে স্পর্শ করেছে। এবং তেমনি হাসি ভরা চোখে তাকাতেন আমাদের দিকে। আজো ভাবতে অবাক লাগে বিশ্বটা যখন নিঝুম, সবাই যখন ঘুমে অচেতন ঠিক তখন এত রাতে কবি একা একা চুপিসারে কি ভাবতেন—এটা কি কবির ধ্যান-না অন্য কিছু?

এ প্রসঙ্গে কবিকে দেখে এবং কবিকে নিয়ে যা উপলব্ধি করতে পেরে ছিলাম তারই বিশ্লেষণ করেছি। কবি নজরুল ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই থেকে অসুস্থ। অসুস্থতার জন্যই আমাদের গৌরব কবি নজরুল আমাদের মাঝে থেকেও গত ৩৪ বছর পূর্বেই আমরা তাঁকে হারিয়ে ছিলাম। কিন্তু তাই বলে তিনি একদম মরে যাননি। এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গেই তিনি ছিলেন। কিন্তু তাঁর যত্ন নেয়ার যে প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। তাঁর যত্ন সেরকম হলে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

কবি যে অবস্থায় এসেছিলেন তার থেকে অন্তত অনেক ভাল অবস্থায়ই আমরা তাঁকে পেতাম। এটা কবি পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতীয়দের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব তারা পালন করেননি। বাংলাদেশে কবি নজরুল কি অবস্থায় এসেছেন তাঁর স্বাস্থ্যই তার প্রমাণ। সে সময় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং বাংলাদেশে আসার পর পরবর্তী সময় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই ব্যাপারটা লক্ষ্য রেখেছেন। এটা ঠিক যে কবিকে গত ৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এদেশে নিয়ে এসে যেরকম পরিবেশ দিয়েছিল, ভারত সরকার তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলেও অন্তত কবিকে স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে আরো সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যেত। কিন্তু তা যারা করেননি। কেন করেননি সে জবাবটা তাঁরা দিতে পারবেন কি? তবে জবাবটা ছোট্ট হলেও Open secret এবং নজরুলের এক সময়ের সঙ্গী শ্রী শান্তিপদ সিংহের লেখাতেই পাওয়া যায়—"নজরুলের দোষটা হবে সে মুসলমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারেও যায়নি"। এখানে বলতে হয় আমারও মত একই—তবে বিশ্ববিদালয় কোন কারণ নয় কারণ ঐ মুসলমান। বলছি এ জন্য যে ভারতের অনেক মহারথীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে যাননি। কিন্তু কবি পরিবার তো কবিকে মনোযোগ সহকারে পরিচর্যা করতে পারতেন। যেমন গ্লাসে করে পানি খাওয়া, চামুচে দিয়ে কিছু খাওয়া, এ সমস্ত অভ্যাসগুলি করাতে পারতেন কবিকে। এমনকি জুতো মোজা পরাবার সময় পর্যন্ত কবির আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। আমার কাছে কবি যে আট মাস ছিলেন তার মধ্যেই চেষ্টা করে দেখা গেছে কবি গ্লাস তুলে পানি খেতে পারতেন, চামচ দিয়ে সামান্য হলেও খেতে পারতেন—তবে ঐ ৩৪ বছর সে চেষ্টা করা হলে আমরা কবিকে অন্যরূপে পেতাম। উল্লেখ্য আট মাস বলছি এ জন্য যে ঐ আট মাস-কাল কবিকে শুধু আমিই দেখাশুনা করতাম, অন্যান্য সবাই কোলকাতা চলে গিয়েছিল। এবং যে ভাবে কবির দেখাশুনা হত আমার কাছে তা যথেষ্ট নয় বলে মনে হত। তাই ওরা চলে যাবার পর আমি অন্তর দিয়ে তাঁর দেখাশুনা করার চেষ্টা করে সে ফল পাই।

উমাকাজীর মুখ থেকে শোনা যেত কবি 'গরুর' গোশ্‌ত খেতে চাননা। কথাটা আমার কাছে আশ্চর্যই লাগত—কারণ কবির ঐ অবস্থায় গরুর গোশ্‌ত চেনার মত অবস্থা ছিল না। উমাকাজীর চলে যাবার পর আটমাস ধরে কবিকে গরুর গোশ্‌ত বেশী খেতে দিয়েছি কিন্তু কোনদিন কবির অসুবিধে হয়নি—এমনকি এ্যালার্জি পর্যন্ত দেখা দেয়নি। গরুর গাশ্‌ত খেতেন না বলে অসুবিধেটা ছিল তাদের—কবির নয়।

www.pathagar.com

এবার আবার নজরুলকে পরিচর্যা কিভাবে করা হত তাই নিয়ে বলব। একরকম পরিচর্যা কবির জন্য হয়ে আসছিল যেটা কবির উপযুক্ত নয়। দুপুরের খাবারের পর কবি বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করলে পর্দা থাকা সত্ত্বেও ভারী কাপড় (কম্বল) দিয়ে জানালাগুলো ঢেকে দেয়া হত। যার ফলে সমস্ত ঘরটাই অন্ধকার হয়ে যেত। অন্ধকার না হলে কবি ঘুমোবেন না বলে যা শোনা গিয়েছিল সেটা ভুল ছিল। ওটা ন্যাচারাল ছিল না। এরপর আলো বাতাসের জন্য ঐ সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টালে দেখা গেল কবির ঘুম আরো ভালো হয়। কবির স্বাস্থ্যও এতে ভালো হয়েছিল। কবির হাতের নখগুলোর নীচের অংশ বেড়ে যাওয়ার দরুন সামান্য বড় রেখেই নখ কাটতে হত। প্রতি শুক্রবার শেভ এবং এক শুক্রবার অন্তর নখ পায়ের এবং হাতের কেটে দেয়ার নিয়ম করেছিলাম।

বাংলাদেশে কবি যে সময় এসেছিলেন সে সময় কবির পিঠে এবং কোমরের নীচে 'বেডসোর' (Bedsore) ছিল। এখানের চিকিৎসায় সেড়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করতে হয় কোলকাতায় কবিকে যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা যাঁরা দেখেছেন তারা অবাক হয়েছেন কবির প্রতি ঐ দেশের সরকারী মনোভাব। বরাদ্দ ফ্ল্যাট অবশ্য কাজী সব্যসাচীর বরাদ্দ ছিল—তার সরকারী চাকুরীতে যতটুকু বা যে শ্রেণীর ফ্ল্যাট পাবার ছিল তাই দেয়া হয়েছিল। দুটো বেডরুম-একটাকে ড্রইং হিসেবে ব্যবহার করা মাঝে মাঝে দরকার হত। পরিসরে কবি যে রুমটাতে থাকতেন সেটা একটু বড় ছিল। কিচেনের দরজা এবং কবির রুমের দরজা পাশাপাশি ছিল। সামনে একটা ছোট্ট বারান্দা—ছোট্ট বাথরুম—অন্য বেড বা ড্রইং রুম বলে উল্লেখিত রুমটির সামনে একটা ক্যারম বোর্ড সাইজ বারান্দা ছিল। এই হল কবির থাকার পরিবেশ। কবি যে খাটটি ব্যবহার করেছেন তার ফোমও ব্যবহারের ফলে টুটা ফাটা ছিল। ইলেকট্রিক, গ্যাস, ফোন বিল সবই দিতে হত সব্যসাচীকে। সরকার মাত্র তিনশত টাকা মাসোহারা কবির জন্য বরাদ্দ করে-ছিলেন। আর পাকিস্তান সরকারের দেয়া মাসোহারা ছিল পাঁচশত টাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন চিন্তাধারার নাম। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে আসছি সেই নজরুলের চিন্তাধারাকে ভুলে যাবার জন্য অলিখিত অনেক চিন্তাধারা বিভিন্ন উপায় কাজে লাগাবার সক্রিয় ভূমিকা সেই থেকে এখন পর্যন্ত অনবরত চলছে। তবু সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে চিরদিনের নজরুল শির উঁচু করে একাই। মাথা নোয়াতে পারেনি। 'শনিবারের চিঠি' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকায় নজরুলের সঙ্গীত প্রবন্ধ-গল্প-কবিতার ব্যঙ্গ করা হত। যাতে নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্ম ত্যাগ

www.pathagar.com

করেন এটাই তাদের একমাত্র কাম্য ছিল। কিন্তু সে কামনা তাদের সফল হয়নি। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কোলকাতা বেতার কেন্দ্র বলতে গেলে নজরুলই প্রাণচঞ্চল রেখেছিলো এবং কবির শেষ অনুষ্ঠান এই কোলকাতা বেতার কেন্দ্রেই যেখানে কবির অসুস্থতা ধরা পরে—কিন্তু নজরুল অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৪২ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের নজরুলের প্রতি ব্যবহারে মনে হয় কত সহজে ইচ্ছাকৃতভাবে তারা এক অতুলনীয় প্রতিভাকে অস্বীকৃতি জানাতে সক্রিয় হয়েছিল' সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে বাংলায় সবচাইতে বেশী তাঁর গানের সংখ্যাকে মাত্র ছয়-সাতটিতে টেনে আনার সাহায্যে ওরা সক্রিয় ছিল। এমনটা কেন হয়েছিল—অনিচ্ছায় মোটেও নয় 'সেরেফ নজরুলকে ফেলে দাও ডাষ্টবিনে' উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। বৃটিশের শাসনকে যেই নজরুল কলমের লেখনীতে দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল সেই লেখনীকে মুছে ফেলতে অনেকেই সচেষ্ট হতে কার্পণ্য করে নি।

বাংলাদেশ সরকার কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪শে মে এ দেশে নিয়ে না আসা পর্যন্ত কবি নজরুল তাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধুবলে পত্রিকায় বেতারে বক্তৃতায় প্রাণস্পর্শী কথা বলতে শোনা যেত প্রতিটি জন্মজয়ন্তীতে, সেই প্রাণপ্রিয়কে একটা ছোট্ট বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়ার সক্ষমতা হয়নি। শোনা যায় শ্রী জ্যোতিবসুর প্রাদেশিক সরকারের আমলে কোলকাতা দমদম এয়ারপোর্টের নিকটবর্তী একটা স্থানে কবির জন্য একটা বাড়ির জন্যে জমি বরাদ্দ হয়েছিল। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে কোলকাতা শহরে যেতে রাস্তার ডানে কবির জন্য প্রদত্ত সেই স্থানটি—নজরুল এভেনু দিয়ে যেতে—চোখে পড়েছিল। ভিত্তির পর কিছুটা কাজ অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু ও পর্যন্তই। হয়নি কেন?

বৃটিশকে হটাবার জন্যে সারা ভারতবাসী যেখানে সম্মিলিত অথচ পঞ্চমজর্জের আগমন উপলক্ষ্যে পঞ্চম জর্জকে উপলক্ষ্য করে যে গান রচিত হল সেই 'জনগণ মন অধিনায়ক হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' গানটি হল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত—রচনার ৩৬ বছর পর। কারণও রয়েছে। পঞ্চমজর্জ নোবেল পুরস্কার কমিটির একজন অন্যতম সদস্য–যার মনোনয়নের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য প্রয়োজন সাফল্যে পরিণত হয়েছিল কিন্তু যে গানের উদ্দেশ্য ছিল কাউকে স্বাগতম জানিয়ে খুশী করা আর সেই গান হয়ে উঠল জাতীয় সঙ্গীত।

তেমনি দেখা যায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের বেলায়। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বঙ্গভঙ্গ রোধকল্পে এই গানটি রচিত। ঐ সময় বাংলাকে ভাগ করে মুসলিম বাংলা হবার একটা তীব্র মত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেটা হল না। মুসলিমরা ভিন্ন হয়ে পড়লে তাদের জীবনধারা উন্নতি

www.pathagar.com

হবার কারণ হতে পারে। তাই বাংলাকে বিভক্ত করতে হিন্দুদের আপত্তি। সলিমুল্লাহ্ বাহাদুরের হঠাৎ মৃত্যুই এই মুসলিম বাংলা আর হয়ে উঠেনি। অবশেষে বাংলা বিভক্ত আর হল না। এবং বাংলা বিভক্ত যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে রচিত 'ও আমার সোনার বাংলা' রচনার ৬৬ বছর পর সেই মুসলিম অধ্যুষিত বাংলার জাতীয় সঙ্গীত হয়ে দাঁড়াল। শুধু তাই নয় এই 'আমার সোনার বাংলা' গানটির সুর পাওয়া যায় নিধু বাবুর একটি সঙ্গীতে যা এই সঙ্গীত থেকে বেশ আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটি চয়নের আগে এ দিকেও দৃষ্টি দেয়া উচিৎ ছিল বলে মনে করি। অথচ এ দু'টো গানের কোনটাই জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রচিত হয় নি।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে অনেকের ধারণা ছিল নজরুলের গান জাতীয় সঙ্গীত হবে। কিন্তু এবারেও সম্মান জুটল না নজরুলের বেলায়। উপযুক্ত অসংখ্য জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেও তাঁর সঙ্গীত পেল না সম্মান—অথচ শুধু ভাল জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা বলেই নয় যে দেশের নব্বইভাগ মুসলমান—হোক না সেটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ—সে দেশে নজরুলের গানই জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত ছিল। তবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে মুসলমানদের ন্যায্য হিস্সা কেটে অন্য ধর্মের কোটায় যোগ সেটাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা যায় না। আর ধর্ম ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ কথার মূল্য কোথায়?

এটাও হতে পারত সরকার এদেশের বর্তমান কবিদের থেকে জাতীয় সঙ্গীত রচনার আহ্বান জানিয়ে একটা বোর্ড গঠন করে উপযুক্ত কবিতাটি বাছাই করে নেয়া এবং সেই কবিতাটিকে একটি সঙ্গীত বোর্ডের মাধ্যমে সুর করে সেটাকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় আনা যেতে পারে।

আলোচনা আরো অগ্রসর হলে দেখা যায় নজরুলের বেলায় কিম্বা মুসলিম সাহিত্যিক কিম্বা মুসলিমদের বেলায় ন্যায্য দাবী উঠলেই এটা লক্ষ্য করা গেছে যে এক ধরণের প্রগতিবাদী মুসলিম সহ অন্য ধর্মাবলম্বীরা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বলে সে দাবীকে বর্জন করবার চেষ্টায় ব্রতী হতো। সমর সঙ্গীত হিসেবে পাকিস্তান আমলেই স্বীকৃতি পেয়েছিল নজরুলের 'চল্ চল্ চল্'—বেঙ্গল রেজিমেণ্টের জাতীয় বা রণ সঙ্গীতরূপে—নতুন কিছু নয়। এমনকি নজরুলকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল পাকিস্তান আমলেই অথচ বাংলাদেশ নজরুলকে সে সম্মান আজো দিতে পারেনি। লক্ষ্য করা যায় শেখ মুজিব ১৯৭২ এর ৬ই ফেব্রুয়ারী কোলকাতা সফরের সময় সি আই টি ফ্ল্যাটে অবস্থানরত কবিকে সালাম জানাবার নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করে শুধু দু'টো পুষ্পস্তবক পাঠিয়ে দেন কবিকে। অবশ্য ভারতের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীও একবার কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করেছিলেন—আশ্চর্য লাগে নজরুলের বেলায়ই কেন এমন হয়? নজরুলকে তারা যে ফ্ল্যাটে রেখেছিলেন সেখানে পদার্পণ করা যায় না? নাকি স্বচক্ষে ঐ পরিবেশ যাতে দেখতে না হয়?

বাংলাদেশে কবিকে নিয়ে আসার পবিত্র কাজটি যদিও শেখ মুজিবই করে ছিলেন তথাপি শেখ মুজিবের কাছে প্রথম এ প্রস্তাব রাখেন মুক্তিযোদ্ধা নায়ক জনাব কাদের (বাঘা) সিদ্দিকী। শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে যেদিন ফিরে এলেন সেই ১০ই জানুয়ারী '৭২ তিনি পশ্চিম বঙ্গে কবির অযত্নের প্রশ্ন প্রথম প্রকাশ করেন। এ কথা জনাব সিদ্দিকী কবির প্রসঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে আমায় বলেছিলেন। তিনি শেখ মুজিবের নিকট কবিকে এদেশে নিয়ে আসার ব্যাপারে যে ভাবে বলেছিলেন এমন দৃঢ়ভাবে না বলা হলে হয়তো কবি ওদেশেই থেকে যেতেন।

১৯৭৪ সালে কবির নাতি-নাতনীদের সাথে কোলকাতায় একবার গিয়েছিলাম, কবি যে ফ্ল্যাটে প্রায় এক যুগেরও অধিক কাল কাটিয়েছিলেন সে ফ্ল্যাটের কবির কক্ষেই ছিলাম আমি। দুঃখ লেগেছিল কবির আবাস স্থল দেখে। সে যাক্, দু'একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, যে ঘটনাগুলোর মনোভাব প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করলে অনেককিছু উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। একবার ব্যাঙ্কের এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। প্রসঙ্গের ফাঁকে এক গ্লাস পানি চাইলে ভদ্রলোক অবাক হয়ে বল্লেন, আপনারা এখনো 'পানি' বলেন কেন? মিয়ার বদলে বাবু না বলাতেও আমাদের দোষ হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে সরে আসার সাথে সাথে যেন পানি এবং মিয়া থেকেও সরে এসেছি। সি. আই. টি ফ্ল্যাটেরই এমনি একজন বলেছিল—'যাদের কবি তারা নিয়ে গেছে'। জবাব দিয়েছিলাম কবির জন্ম থেকে বাংলাদেশে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুই পশ্চিম বঙ্গে হয়েছে। তবে যাদের কবি তারা নিয়ে গেছে বলে এ দেশের কিছু করণীয় নেই এ জাতীয় ধারণা ভুল। কোলকাতার যাত্রীবাহী বাসগুলোতে দেখেছি পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, সাঁইবাবা, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, সুভাষবসু, ইন্দিরাগান্ধী, সি. আর. দাসের ছবি অথচ নজরুলের ছবি দেখিনি। ছবি বিক্রির দোকানগুলোতে পর্যন্ত। ১৯৬৫ সালে এদেশের একজন অধ্যাপক নাম সাখাওয়াত হোসেন গিয়েছিলেন কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে। সি. আই. টি ফ্ল্যাটে গিয়ে কবি কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস করাতে অবাক হলেন জবাব শুনে, কাজী নজরুল ইসলামকে ঠিক চিনতে পারছেনা। অবশেষে খিলখিল, মিষ্টির দাদু হিসেবে ঠিকানা মিলল। ঐ সময় কবির পরিচয় এমনি হয়েছিল। তাই এ সব ঘটনার মনোভাব একত্র করলে বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছিল 'নজরুল-সমুদ্র'কে অস্বীকার করতে।

www.pathagar.com

১৯৬৩ সালের পর আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র নজরুল গীতির প্রচলন বৃদ্ধি করে। লক্ষ্য করা যায় নজরুলগীতি গাইবার কণ্ঠ থাকা সত্বেও শিল্পীরা গাইতেন না। যেমন সত্য কোলকাতার প্রচার মাধ্যমগুলোতেও নজরুলগীতির প্রচারের কোন উৎসাহ ছিল না। অবশেষে শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং ফিরোজা বেগমের একই রকম পরিশ্রমে নজরুলগীতির প্রচলন আবার শুরু হয়। এখন এই '৮৬ সালে নজরুলগীতির জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। কিন্তু নজরুগীতি অনেকেই গাইছেন তবে নজরুলের সুর থেকে সরে যাবার প্রবণতাই তাদের মধ্যে বেশী। নজরুল তাঁর গানে শিল্পীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেই কি এরকম হচ্ছে? এখন নজরুলগীতি 'অমুক স্টাইল' বলে কথা হচ্ছে—আমার যতটুকু ধারণা তাতে বলা যায় যে জনমনে একবার কথা চালু হলে সেটা ধীরে ধীরে সবার কণ্ঠেই চলে আসে—ব্যাপারটা কেউ তলিয়ে দেখতে চান না। প্রচার মাধ্যমগুলোর লক্ষ্য রাখতে হবে নজরুলগীতির উপর। এদেশের প্রচার সংস্থাগুলোর নজরুলগীতির দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা নজরুলের সুর সম্পর্কে মোটেও ধারণা রাখেন না। একই গান সকালে এবং বিকালে দুরকম সুর দুরকম তাল-এ শোনা যায়। স্টাইল প্রতিটি শিল্পীরই আছে তবে নজরুলের গানে নজরুলের স্টাইল থাকাই বাঞ্ছনীয়। এখনো পর্যন্ত মূল সুর থেকে একদম সরে এসেছে বলে দেখা যায় না। প্রখ্যাত শিল্পীদের নজরুলের গানকে পরিবেশন করার পূর্বে আরো যত্নবান হওয়া দরকার। আরো যত্নবান হওয়া দরকার যার মাধ্যমে এর প্রচার হবে সেই প্রচার সংস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের। উল্লেখ্য এমনি একজন দায়িত্ববান ব্যক্তির মুখ থেকে যখন শোনা যায় একজন শিল্পীর নাম ধরে যে অমুক শিল্পীর মত করে যারা গাইবে তাদেরকেই বেশী সুযোগ দেয়া হবে, আবার তারই মুখে যখন শোনা যায় নজরুলের সুরকে যারা বজায় রাখবে তাদের সুযোগ দেয়া হবে বেশী—সেখানে কতখানি সঠিক সুরের প্রচার আশা করতে পারি। এক্ষেত্রে প্রচার কর্তৃপক্ষকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের বিশ্ব-ভারতীর প্রতি দৃষ্টি রাখতে প্রয়োজন মনে করি। উল্লেখ্য সামান্য ভুল সুরে গাওয়ার দরুণ এবং বিদেশী যন্ত্র ব্যবহারের জন্য এ সময়ের সেরা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে পর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে নিষেধ করা হয়েছিল। এবং শিল্পীর মৃত্যু পর্যন্ত তার কণ্ঠে আর রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড হয় নি। অথচ নজরুলগীতির বেলায় এরকমটা নেই। তবে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নজরুলগীতি এক রকম বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্বাধীনতা নেই নজরুলগীতিতে রয়েছে। এই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, জ্ঞানও রাখতে হবে।

www.pathagar.com

কিছু প্রমাণ দিচ্ছি যা পড়লে জানা যাবে সঠিক চিত্রটি নজরুলের গান এখন কিরূপ দাঁড়াচ্ছে; শুধু সুর নয় এমনকি কথায়ও ব্যতিক্রম হচ্ছে আমি সে আলোচনাই করছি কি কি ভাবে গানগুলোকে ভুল পরিবেশিত হচ্ছে তা নিয়ে। 'নায়কী' এবং 'গায়কী' বলে সঙ্গীতে দুটো দিক রয়েছে। 'নায়কী' যিনি সুর সৃষ্টি করেছেন তার সুরকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্পীর গান পরিবেশন এবং 'গায়কী' হয়ে যিনি গাইছেন তিনি তার কণ্ঠকে সুরকারের দেয়া সুরকে আয়ত্বে এনে বিভিন্নভাবে পরিবেশন করা। এবার দেখা যাক্ নজরুল তাঁর সঙ্গীতে স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে 'খুটো ছাড়া গরুর মত অবাধ বিচরণ' করতে বলেন নি কখনো। নজরুলের সুর থেকে সরে গায়কের সুরে গাইবার কথা হাস্যস্কর। যেটা ইদানিং সব শিল্পীরাই নজরুলের গানকে নিয়ে পরীক্ষা করছে। কিন্তু নজরুল তাঁর গানে যে সুর দিয়ে গেছেন বা কথা দিয়ে গেছেন সে থেকে অন্য কোন কথা বা সুর সে সঙ্গীতে যোগ দিলে বা পূর্বের নজরুলের দেয়া সুরকে বদলে সে গান যে নজরুলগীতি রইল না. সেদিকে কি তারা লক্ষ্য রেখেছেন? আর নজরুল তাঁর গানের কাঠামো মানে যে সুর দিয়ে গেছেন তা কখনোই পাল্টাতে স্বাধীনতা দেন নি। দিয়েছেন যে কাঠামো ঠিকই থাকবে এবং গায়ক গাইবার সময় সেটাকে অলঙ্কৃত করতে পারেন যদি সে গায়কের গানে অলঙ্কার পরাবার ক্ষমতা থাকে। আর অলঙ্কার মানে সুর থেকে একদম সরে যাওয়া, যা ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে নজরুলের গানে তা নয়। নজরুল তাঁর গান সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন তার দুটো মাত্র উদাহরণ দিলে প্রমাণিত হবে। একবার অর্দ্ধেন্দুবাবু বলে এক গায়ককে তাঁর গান ভুল পরিবেশন করার জন্য নিষেধ করে বলে ছিলেন যে "আপনি যেন আমার গান গাইবেন না। আমার গান আমিই গাইব"। গায়কটি বল্লেন "সে কি, আজ সকাল থেকে আপনার দুটো গান সেধে রেখেছি। আর আপনার গানই তো বাজার মাৎ করে রেখেছে।" কবি বল্লেন "তা হোক। আপনি রবীন্দ্রনাথ কিম্বা অতুল প্রসাদের গান করুন।" পরে ঐ বিষয় কবিকে জিজ্ঞেস করলে কবি বল্লেন, "আরে ও একটা বোম্বাই বাঙ্গাল। গানের কথাগুলো ভাল করে পড়ে না।" অন্য একবার শান্তিপদ সিংহ কবির "এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা"র 'তবু যেন তা'র স্থলে ভুল করে 'তবু কেন তা' শিখছিলেন। কবি শুনতে পেয়ে বল্লেন "ওরে ও মা শীতলার বাহন ওটা তবু কেন তা নয়, তবু যেন তা।" এতটা সচেতন ছিলেন কবি তাঁর গানের প্রতি। আর ইদানিং নজরুলের গানের কথা প্রায় প্রতিটি গানেই দু'একটু এদিক-সেদিক করেই রেডিও-টিভিতে পরিবেশিত হচ্ছে অথচ অনুষ্ঠান প্রযোজকরা শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনের পর শিল্পীকে বিনা বাক্যব্যয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। এত অসাবধানতাই এখন নজরুলের গানকে

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত করতে বাধ্য করছে। যেমন ঢাকা রেডিও থেকে জনৈকা শিল্পী গাইলেন, "মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ" গানটি "আমারি মত কাঁদে দিশাহারা' বলেই শিল্পী গানটির মুখে চলে আসছেন—আশ্চর্য।" হারায়ে নয়নী নয়ন তারা" লাইনটি গাইবে কে? একবার নয় বেশ কবার ঐ টেপটি প্রচারিত হয়েছে—প্রশ্ন হচ্ছে রেডিও কর্তৃপক্ষ কি একবারও শুনতে পাননি? না অন্ধতার প্রমাণ। অণুপ ঘোষাল রেকর্ড করেছেন "চোখের নেশা ভালবাসা' গানটিকে কার্ফা তালে অথচ ইদানিং গানটি বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসে জনৈকা শিল্পীর কণ্ঠে প্রচারিত হচ্ছে 'তেওড়া'তে। গানটি দাদরা এবং কার্ফা তালেও রেডিওর অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত হতে শোনা যায়। 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গানটির প্রথম অন্তরার 'কেউ শীতল জলরে হেরে অশনির জ্বালা'র স্থলে শুধু হেরে অশনির জ্বালা' বলে শুরু করেই আবার ঠিকভাবে গাইতে শোনা যায় এবং আবোল-তাবোল উচ্চারিত গানটির টেপটি এখনো বাজানো হয়। কর্তৃপক্ষ নজরুলগীতিকে যেমন ইচ্ছে তেমন প্রচার করলে ক্ষমা পেতে পারেন না।' 'হয়তো তোমার পাব দেখা' গানটি দু'শিল্পী দুরকমভাবে ঝুমুর এবং কার্ফাতে প্রচার করে যাচ্ছে। 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন' একই ভাবে দাদ্‌রা এবং একতালে গাওয়া হচ্ছে। প্রচার যন্ত্রগুলো কি একবারও ভেবেছেন যে নজরুলের গানকে তারা কতটা দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন। নজরুলের গানকে সঠিকভাবে রক্ষা করতে হলে যতদিন পর্যন্ত অভিজ্ঞ নজরুলের সুর সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে বোর্ড না হচ্ছে অন্তত ততদিন প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রয়োজন এই গানের প্রচারে সাবধানতা অবলম্বনে মনোনিবেশ করা এবং নজরুলের গানের সুর এবং কথার প্রতি জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করা। কারণ নজরুলের গান এবং সমগ্র নজরুল আমাদের জাতীয় সম্পদ। এখনো কোলকাতায় নজরুলের গানের বিশেষজ্ঞ অনেকেই জীবিত রয়েছেন, তাঁদের থেকে টেপ কিম্বা স্বরলিপি করে নিয়ে এসেও এগুলো প্রচার করা যেতে পারে।

এবার কিছু গানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যেগুলোর সুর কিছুটা অন্যভাবে রেকর্ড করা হয়েছে—নজরুলের গানে বিস্তার করার সুযোগ এবং অলংকরণ প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে বলে হয়তো শিল্পীরা গায়কীতে সে সুযোগ নিয়েছে। এর ফলে সুরগুলোতে আগের থেকে দু'এক স্থানে অন্যরকম হয়েছে—। 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' কাজী নজরুলের নিজের করা স্বরলিপি রয়েছে 'নজরুল-স্বরলিপি' গ্রন্থে, কিন্তু প্রতিমা বন্দোপাধ্যায় কোলকাতায় যে রেকর্ড করেছেন তা নজরুলের করা স্বরলিপি থেকে অনেক পার্থক্য—গানখানি এখন এই সুরেই প্রচলিত রয়েছে। 'পরো পরো চৈতালী সাঁঝে' গানটি দাদ্‌রা-কার্ফা সমন্বয় তাল ফেরতায় স্বরলিপিতে

www.pathagar.com

রয়েছে—কিন্তু মানবেন্দ্র রেকর্ড করেছেন অর্ধত্রিতালে। 'আসল যখন ফুলের ফাগুন'এর শেয়র স্থানে 'গোরস্থান'কে গেরস্থান উচ্চারণ করে রেকর্ড করেছেন মানবেন্দ্র। পলাশ ফুলের মৌ-পিয়ে ঐ' এক তালে নিবদ্ধ গানটিকে মানবেন্দ্র তেওড়াতে রেকর্ড করলেন। বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে' গানটিতে নতুন ঢং সংযোজন করে রেকর্ড করলেন শিল্পী মানবেন্দ্র। 'করুন কেন অরুণ আঁখি' গানটিতে শেয়র যোগ করা হয়েছে অনুপ ঘোষালের রেকর্ডে যা নজরুলের 'সুর-মুকুর' বইতে নেই। 'সাধ জাগে মনে' যশস্বী শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমদের গাওয়া রেকর্ড থেকে আরেক যশস্বী শিল্পী মানবেন্দ্র বসু সরে গিয়ে রেকর্ড করলেন গানটি অপূর্ব হয়েছে বলতে হয় পরিবেশনে। বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ' গানটি মানবেন্দ্র অন্য সুরে রেকর্ড করেছেন। অনুপ ঘোষাল 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' গানটিতে শেয়র যোগ করে রেকর্ড করলেন যা নজরুলের 'সুর-মুকুর' স্বরলিপিতে নেই। 'এ নহে বিলাস বন্ধু' মানবেন্দ্রর সুন্দর পরিবেশন নজরুলের 'সুর-মুকুর' থেকে অন্যরকম হয়েছে। 'আধো আধো বোল' গানটি মানবেন্দ্র এবং পরে মহম্মদ রফী পূর্বের বেচুদত্তর থেকে অন্যরকম করেছেন। 'এত জল ও কাজল চোখে' গানটিতে মানবেন্দ্র কয়েক স্থানেই অন্যরকম সুর সংযোজন করেছেন যা গানটিকে আরো অলঙ্কৃত করেছে। 'বঁধু মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া' মানবেন্দ্র এবং ফিরোজা দু'রকমভাবে রেকর্ড করেছেন। 'মুসাফির। মোছরে আঁখিজল' গানটি মানবেন্দ্র এবং ফিরোজা ভিন্ন ভিন্ন রেকডে কেউই পূর্বের কাশেম মল্লিকের মত করে গান নি। উভয়েই 'এ পথে ঝরে সদা ফুল'এর স্থলে 'এ দেশে ঝরে শুধু ভুল' গেয়েছেন। 'আমি যদি আরব হতাম' গানটি এখানের প্রচার মাধ্যমগুলোতে 'পেয়ে সে নিয়ামত'এর স্থলে 'সবার আগে' বলে প্রচারিত হত। গানটি বর্তমানে কোলকাতার অনুপঘোষাল 'পেয়ে সে নিয়ামত' বলেই রেকর্ড করেছেন। কিন্তু সুর একদম পাল্টে দিয়েছেন সকিনা (হেরিমতি) বিবির করা রেকর্ড থেকে যা এখানে গীত হয়ে আসছে সব সময়ই। অনুপ ঘোষালকে ধন্যবাদ ইসলামী গান রেকর্ড করবার জন্য। 'এলো ঐ পূর্ণ শশী ফুল জাগানো' গানটির পূর্ণশশীর স্থলে পূর্ণিমা চাঁদ হবে। এবং 'বয়ে যায়'এর স্থলে বহে বায় হবে। 'প্রিয় যেন প্রেম ভুল না' গানটি বর্তমানে শেফালী ঘোষ এবং পূর্বে ১৯৩০ সালে কমলা ঝরিয়া কর্তৃক রেকর্ডকৃত এ গানটিকেও দুঃখপূর্ণভাবে প্রণব রায় লিখেছেন বলে ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছে। 'প্রদীপ নিভায়ে দাও' গানটির 'বাহুর বন্ধন'কে বাহুর বাঁধন' করে বর্তমানে মানবেন্দ্র রেকর্ড করেছেন। কবির হস্তলিখিত এ গানটি লক্ষ্য করলেই পাওয়া যাবে। 'ওগো ফুলের মত ফুল্লমুখে' গানের শেষ লাইনে 'করুণ তুমি বিফল মনে কাঁদিস সমতুল'-এর বিফল মনের স্থলে 'বিসর্জনের' এবং কাঁদিস

www.pathagar.com

এর স্থলে দেবীর হবে। নজরুলের জীবনের যতদূর জানা মতে শেষ রচয়িত গানটি 'খেলা শেষ হল হয় নাই বেলা' গানটির সঞ্চারীতে কবি রচেছিলেন "যাহারা আমার বিচার করেছে আর তাহাদের কেহ, দেখিতে পাবেনা কলঙ্ক-কালি মাখা মোর এই দেহ" কিন্তু সেটার পরিবর্তে গাওয়া হয় "যাহারা আমার বিচার করেছে ভুল করিয়াছে জানি—তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গান খানি।" তবে কবি যা রচনা করেছিলেন সেটাই গাওয়া প্রয়োজন। 'তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন' গানটির 'দোজখ' এবং 'বেহেস্ত' স্থলে 'নরক' এবং 'স্বরগ' বলে গাইতে শোনা যায়। 'বিকাল বেলার ভূঁই চাঁপা গো' গানটির 'আসন' স্থলে 'আঁচল', 'কারে গাঁথি' স্থলে 'কারোই বা দিই' কারে বুকে থুই' স্থলে 'সমান প্রিয় দুই' 'যুথি' স্থলে 'যূঁই' প্রাতে' স্থলে 'রাতি' 'কাঁদি আমি যুথির সাথে' স্থলে 'তারই আমি রুবির সাথী' বলে গীত হচ্ছে। এ গানটি সম্পর্কে কবির ছাত্রী শ্রীমতি রেণু (বসু) ভৌমিক আমায় বলেছিলেন কবি তাকে যে ভাবে যে যে কথায় শিখিয়েছিলেন তা হচ্ছে ঐ রূপ। 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়' গানটি এখানের প্রচার মাধ্যমে জনৈকা শিল্পীর নিজের কল্পিত সুরে গাইছেন। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী' গানটি মানবেন্দ্র প্রথম অন্তরাতে অন্যরকম গেয়েছেন। পঙ্কজ কুমার মল্লিক বেশ ক'বছর আগে কোলকাতা বেতারের সঙ্গীতে শিক্ষার আসরে 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটির 'পায়ের কাছে' স্থলে 'কোলের কাছে বলে শিখিয়েছিলেন। খেলিছে জলদেবী'র 'জলদেবী'কে জলমোতী করে গাইবার প্রবণতা অনেকদিন ছিল। 'মোর নিশীথের চাঁদ' গানটির রেকর্ড যিনি করেছেন কবির কাছে শিখে নিয়ে সেই শ্রীমতি রেণুভৌমিক এখানে বেশ কটি স্থানে যে সুরে পরিবেশন করেছেন সেটাই মূল সুর। ইতিপূর্বে এবং বর্তমানেও ঢাকায় যেভাবে গানটি গাওয়া হয় সেটা ভুল সুর। 'সখি বলো বধূয়ারে' গানটি ফিরোজা বেগম এবং ইলা বসু পৃথকভাবে। ইলা বসু গানটিতে শেয়ার যুক্ত করে রেকর্ড করেছেন যা এর আগে ছিলনা—নজরুলের 'সুর-মুকুরে' নেই।

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় সঙ্গীত এবং ইসলামী সঙ্গীত নিয়ে কিছু আলোচনা করছি। এটা সর্বজনবিদিত যে উল্লেখিত সঙ্গীতে নজরুলের অবদান অতুলনীয়। তথাপি এটা লক্ষ্যণীয় যে কোলকাতার আকাশবাণী এবং ঢাকার প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথাক্রমে ইসলামী এবং হিন্দু ধর্মীয় এবং শ্যামাসঙ্গীতের দিকে তেমন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। এপ্রসঙ্গে ঢাকার প্রচার মাধ্যমগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে রচিত নজরুলের গানগুলো প্রচার করতে কোন অসুবিধে না হলে শ্যামাসঙ্গীত প্রচারে অসুবিধেটা কোথায়? কিছু গান উল্লেখ

www.pathagar.com

করছি—কাজরী গাহিয়া এসো গোপললনা, মম বন ভবনে, ব্রজগোপী খেলে হোরী, আজি দোল্ ফাগুণের দোল লেগেছে, বনে চলে বনমালী, বনে যায় আনন্দ দুলাল, পদ্মার ঢেউ-এর "এই পদে ছিল রে যার রাঙ্গা পা' রুমঝুম রুমঝুম ঝুমঝুম নূপুর বাজে আসিলরে প্রিয় আসিলরে, কিম্বা সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচ নটরাজ গানগুলি রীতিমত প্রচারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত। এবং এটা অতীব আনন্দের যে কোলকাতার আকাশবাণীও অনুপ ঘোষালের 'আমি যদি আরব হতাম', ধীরেন বসুর যেদিন লব বিদায়, প্রচার করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কোলকাতা এবং ঢাকার প্রচার মাধ্যম গুলো এক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। এবং কবির মহামূল্যবান বাণী "ছুঁলেই যদি জাত যাবে জাত ছেলের হাতে নয়তো মোয়া" কথাটির মূল্য রেখেছেন। দেরীতে হলেও এটা অত্যন্ত সুখের এবং শুভ পদক্ষেপ। কবির কীর্তন গান আগে থেকেই প্রচারিত হয়ে আসছে। উল্লেখ করতে হয় অ-প্রচারের ফলে নজরুলের অনেক মূল্যবান সঙ্গীতকে আমরা হারিয়েছি এবং হারাতে বসেছিলাম। শ্যামাসঙ্গীত-কীর্তন-দোলসঙ্গীত, সহ অন্যান্য দেব-দেবীদের জন্য তাঁর রচিত গানগুলোকে প্রচার করা 'ফরজ'। নয়তো নজরুলের বেলায় চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী এ গানগুলো আমাদের জেনে শুনেই হারাতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য বহু পূর্বে হারিয়ে যাওয়া নজরুলের ৪২ খানা গানের একটি খাতা কোলকাতার হরফ প্রকাশনীর জনাব আবদুল আজিজ আল আমান সাহেব পেয়েছেন। তেমনি কবির বিখ্যাত একটি গান কবি বন্ধু কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ বাজারে না পেয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তারা সে গানটি নষ্ট করে ফেলেছে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সস্ত্রীক ১৯৭২ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশ সফর কালে কবিকে দেখতে এসেছিলেন কবি-ভবনে। এতবড় বাড়ি কবির জন্য বরাদ্দ হয়েছে দেখে তারা অবাক এবং খুশী হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত রবীন্দ্র বিশারদ শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরো বাড়িটাই কবির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে কি ? সত্যি। আশ্চর্য হবার কথাই। কারণ কবির সুদীর্ঘ জীবনে এত এত কবির বন্ধু আপনজন বলে বিবেচিত স্বীকৃতরা পশ্চিমবঙ্গে কবির আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও কবিকে সি আই টি বিল্ডিংসের চতুর্থ শ্রেণীর অফিসারদের জন্য বরাদ্দ একটি ফ্ল্যাটের কাজী সব্যসাচীর নামে বরাদ্দ দোতলার ছোট্ট একটি কক্ষে শেষ দিন-গুলো অতিবাহিত করছিলেন—সেখানে এত বড় বাড়ি ?

www.pathagar.com

উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালেও নজরুলকে নিয়ে এখানকার সংবাদপত্রসহ প্রচার-মাধ্যমগুলোতে ত্রিশালের দরিরামপুর অঞ্চলের নামাপাড়া থেকে আগত হরিমন নেসা নামক জনৈকা মহিলার বিভ্রান্তিকর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ছিল বয়সে ৬০ বছরের মহিলা ১৯১৩ সালের নজরুলকে ১৯৭৩-এ স্মরণ করে সাক্ষাৎকার কি করে দিতে পারে? কাজীর সিমলার দারোগাবাড়ী এবং দরিরামপুরের হরিমন নেসাদের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে যে রেষারেষি ওখানে গিয়ে লক্ষ্য করেছি তাতে কাজীর সিমলায় বাসকারী দারোগা জনাব কাজী রফিজুল্লাহ (অনেকে রফিকুল্লাহ বা রফিকুদ্দিন বলে ভুল করেন) সাহেবের স্ত্রী বেগম সামসুন্নাহারের তথ্যাদি রেকর্ড করে রাখার জন্য—১৯১৩ সালে এক বছরের কবির জীবনীর জন্য। নইলে ভিত্তিহীন তথ্যাদি দানা গাঁথবে। নামাপাড়া হচ্ছে নজরুলের স্কুলে যাতায়াতের অসুবিধের জন্য বর্ষাকালে তিন মাসের জন্য জায়গীর কেন্দ্র। ১৯৭৫-এর ২৩শে মে দৈনিক আজাদে আমার 'নজরুলের স্মৃতিঘেরা ত্রিশাল' অনেক সাহায্য করবে।

একবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সমর সেন একজন শিল্পী-সমেত কবিকে দেখতে এলে সেই শিল্পী 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' গাইলে আমি 'মোহাম্মদের নাম জপেছিলি' গেয়েছিলাম। কবির অমর সৃষ্টি ইসলামী সঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত কবির সম্মুখে পরিবেশিত হলে শ্রী সেন খুশী হয়েছিলেন।

নজরুলকে ভক্তদের মাঝে নির্ধারিত সময়ে পাওয়া যেত। তবে অনুরোধক্রমে কবির স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পাল্টানোও হত। খুব কমই এরকম হত। দূর থেকে আসা ভক্তদের জন্যই এরকম হত। প্রথম দিকে প্রচুর ভিড় হত প্রতিদিন। প্রথম দিনের এ রকম ভক্তসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত ছিল যারা একনজর কবিকে দেখে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এবং এমনি ভিড় কবি ভবনে বেশ কদিনই দেখা গিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে ভক্ত সংখ্যা কোন কোনদিন পনর-বিশজন থেকে হাজার ছাড়িয়ে যেতেও লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে শিল্পী, সাহিত্যিক, কৃষক, জেলে, কুলি, দিন-মজুর, গাড়ীওয়ালা ইত্যাদি থাকতো। রেডিও বাংলাদেশ থেকে একজন তবলচী প্রথম থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রথমে ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন, এরপর আতিকুর রহমান এবং সবশেষে পরিতোষ কুমার সাহা। রেডিও বাংলাদেশ সব সময়ের জন্য কবিভবনে একটি হারমোনিয়াম এবং একজোড়া বায়া তবলার ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে কবির গান শোনার জন্যে কোন বিঘ্ন না ঘটে। তবে হারমোনিয়াম পরবর্তী সময়ে সেপ্টেম্বর '৭২ নাগাদ নিয়ে গিয়েছিল রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ—কবিকে তেমন কেউ গান শোনায় না এই অজুহাত

www.pathagar.com

রেখে। এ জন্য সে সময় কবি মাস খানেকের জন্য গান শুনতে পাননি। অবশেষে কবির নাতি-নাত্নীরা মীর্জাপুর আর. পি. সাহার বাড়িতে দাওয়াতে-বেড়াতে গেলে তাঁরা কবির নাতি-নাত্নীদের একটি হারমোনিয়াম উপহার দিয়েছিলেন। যার ফলে এরপর কবিকে গান শোনাতে কোন অসুবিধে দেখা দেয়নি। অবশ্য এরপর আমার কবিভবনে স্থায়ীভাবে থাকা নির্ধারিত হলে আমার হারমোনিয়ামও কবির পাশে রাখা হত। অবশেষে উমাকাজী রিজিয়া বেগমে পরিণত হয়ে বিয়ে করে বেরিয়ে গেলে কাজী সব্যসাচী ইসলাম ১৯৭৫-এর জানুয়ারীর দশ তারিখে নাতি-নাত্নীদের উপহার দেয়া হারমোনিয়মটি কোলকাতা নিয়ে গেলে ২২শে জুলাই কবির পি.জি হাসপাতালে চলে আসা পর্যন্ত আমার হারমোনিয়ম দিয়েই কবিকে গান শোনান হত। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীর ঐ দশ তারিখেই কবির একমাত্র জীবিত পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামকে শেষবারের মত কবির পাশে দেখা যায়।

যারা কবিকে দেখতে কিম্বা শ্রদ্ধা জানাতে আসতেন তাদের মধ্যে কেউবা গান শোনাতেন। কেউ বা আবৃত্তি করতেন, কেউবা প্রবন্ধ-গল্প পড়ে শোনাতেন, কেউ বা নৃত্য পরিবেশন করতেন, কেউ বা বাঁশী সেতার-গীটার-ম্যাণ্ডোলিন বেহালা বাজিয়ে শোনাতেন। কাউকে দেখা যেত কবির পা নিয়ে কদমবুসি করতে, কেউ বা হাত মেলাতেন, কেউ বা কবির হাতে কিম্বা কপালে চুমো খেতেন, কেউবা দূর থেকেই অভিবাদন করে দাঁড়াতেন, কেউ বা শুধু সেরেফ কবিকে দেখে যেতেন। এদের মধ্যে অনেকেই কবির দৈনন্দিন খোঁজ খবর নিতেন। প্রত্যেককেই জানাতে হতো কবির দৈনন্দিন ঘটনার কিছু কিছু। মাঝে মাঝে দু একজন আসতেন যাঁরা গান জানতেন কিন্তু হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন না, সে অবস্থায় আমাকে তাদের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাতে হ'ত। মাঝে মধ্যে তবলচী পরিতোষ থাকতেন না। তখন তবলাও আমাকে বাজাতে হত। এই সময়গুলোতে কবি গান শুনে হাসতেন, কাঁদতেন, শিল্পীর সামনের হারমোনিয়ামের উপরে রাখা খাতা তুলে নিতেন, জিভে আঙুল ভিজিয়ে পাতা উল্টাতেন, দেখাশেষ হলে হয় শিল্পীর সামনের যথাস্থানেই রেখে দিতেন, নয় খাটের মাথার পাশে ফেলে দিতেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন কবি যখনই হাসতেন কিম্বা বেশী খুশী হতেন তখনই মাথায় হাত দিয়ে চুলকোবার মত করতেন, মুখ নাড়াতেন বেশী, অব্যক্ত এক রকমের শব্দ করতেন, নাকে-মুখে হাত বারে বারে রাখতেন, অবশেষে চোখে মুখে কান্নার ভাব করতেন এবং অনেকসময় চোখের কোণে পানিতে ভিজে গড়িয়ে পড়ত। হয়তো গানের সময় গানের মধ্যেই তিনি ধমকে উঠতেন, ভক্তদের আঙুল দিয়ে

www.pathagar.com

হারমোনিয়াম-তবলা দেখাতেন গান পরিবেশিত যখন না হত সে সময় এরকমটা করতেন। ভক্তদের চোখে চোখ রাখতেন। শুয়ে পরতেন-গান নেই ত বসে থেকে কি লাভ এই যেন ভাবটা। হয়তো উঠে পড়তেন, বাইরে বারান্দায় চলে যেতেন, খানিক পরেই ফিরে আসতেন, হয়তো বারান্দায় চলে গেছেন—আসছেন না-দেরী করছেন-হারমোনিয়ামের আওয়াজ করলেই চলে আসতেন—। এসে বসতেন, গানের জন্য অপেক্ষা করতেন-নয়তো উঠে আবার চেয়ারে গিয়ে বসতেন—এমনি করে কেটে যেত কবির সময়। ভক্তরা আনন্দ পেতেন। যারা দেখতে আসতেন তাদের মধ্যে কেউ গান না জেনে থাকলে আমাকে গাইতে হত, ভক্তরা আনন্দ পেতেন, গানের কবি, গান শুনে কেমন ব্যাকুল হয়ে পড়েন স্বচক্ষে দেখে তারা আনন্দ পেতেন। দোয়া পেতাম-ভক্তদের মধ্যে কেউ হয়তো বলে যেতেন আপনি গান করলেন বলেই এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হল নইলে এ দৃশ্য শুধু পত্রিকা মারফত দেখতে পেতাম—স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হত না।

ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ কবিকে শ্রদ্ধাভরে টাকা দিয়ে যেতেন। কেউ বা টাকা দিয়ে কিছু একটার নাম বলে দিতেন কবিকে কিনে দেবার জন্য। কেউবা হাতে করে আম-আনারস, কমলা, কলা নিয়ে আসতেন, কেউবা হরলিক্স, ওভালটিন, সন্দেশ-রসগোল্লা-চমচম ইত্যাদি আবার কেউ বা কাপড়-পাঞ্জাবী ইত্যাদি শ্রদ্ধাভরে কবিকে দিয়ে আনন্দ লাভ করতেন।

আমার মনে পড়ে একবার এক বৃদ্ধ মুখে সাদা দাড়ি. লুঙ্গি পড়া পরণে পাঞ্জাবী বয়সে প্রায় সত্তরের মত, এসেছিলেন কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি সে সময় কবি ভবনের সামনে চেয়ারে রোদে বসে ছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাস ১৯৭৫-এর, শীতও ছিল কিছু। কাউকে কিছু না বলে বৃদ্ধ এসে কবির পায়ের কাছে বসলেন। কবির পায়ে জুতো ছিল। হঠাৎ বৃদ্ধ লোকটি কবির পায়ের জুতোর নীচের লেগে থাকা মাটি তুলে নিজের সারা মুখটাতে মেখে নিলেন। এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে বল্লেন, আমি কবির একজন ভক্ত। লেখাপড়া তেমন জানেন না। তবুও ছোটকাল থেকে কবির লেখা কাগজে বেরুলে কেটে রাখতেন, এমনকি কবির ছবিও কেটে রেখেছেন। আজো তিনি সেগুলো সংগ্রহে রেখেছেন। কবিকে দেখার অনেক দিনের সাধ পুরণ করলেন এবং কবিকে দেখতে পেয়ে এবং শ্রদ্ধা জানাতে পেরে তিনি কত যে খুশী সেটা তার মুখেই প্রকাশ পাচ্ছিল।

অন্য একটি ঘটনা, কবি তখন কবি ভবনের নীচের তলার পেছনের দিকে একটি কক্ষে থাকতেন। এ কক্ষটিতেই কবি বাংলাদেশে এসে প্রথম রাত্রি কাটান। এরপর কবি কিছুদিন উপরের তলার সামনের কক্ষটিতে অবস্থানের পর আবার

www.pathagar.com

এই কক্ষটিতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু ডাইনিং রুমটি পাশে থাকাতে কবির বিশ্রামে অসুবিধে হবে বলে আবার উপরের তলায় সামনের কক্ষে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং পি জি হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় পর্যন্ত কবি ঐ রুমেই অবস্থান করেছিলেন। সে যাক্ যে সময়ের ঘটনা এখন বলছি সে সময় কবি নীচের তলার পেছনের রুমে থাকতেন। ভক্তরা ঐ রুমেই কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। একদিন আমি কবির রুমে গানের আওয়াজ শুনে এবং সে আওয়াজ বড় মধুর বলেই একটু তাড়া করেই কবির রুমে ঢুকলাম। কবিকে দেখলাম মনযোগ-সহকারে গান শুনছেন। গগল্‌স পরিহিত এক ভদ্রলোক একাগ্রতার সঙ্গে গান শোনাচ্ছেন। ভদ্রলোককে আমি কখনোই দেখিনি। তবে তার গলার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম বহু দিন থেকেই। নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়, ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি, শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না, এমনি কয়েক-খানি গানের পর ভদ্রলোক হারমনিয়াম বন্ধ করলেন। তার সাথে আরো ক'জন এসেছিলেন। এর মধ্যে ওদের মাঝ থেকে অন্য একজন গান ধরলেন। গান শেষ হলে ভদ্রলোক তার সাথে আসা ছোটদের উদ্দেশ করে বললেন, কবিকে সালাম করেছ? না বলাতে, বলে উঠলেন 'কর কর সালাম কর--পা ছুঁয়ে সালাম কর'। ওদের সালাম করা শেষ হলে তিনি বলে উঠলেন 'কবির পা' কোথায় রে, আমায় একটু ধরিয়ে দে'। ওরা ধরাধরি করে কবির পায়ের কাছে নিয়ে গেলে ভদ্রলোক হাটুগেড়ে বসে কবির পায়ে নিজের মাথা নুয়ে সালাম করলেন। হ্যা, এ রকম ভক্তি আছে বলেই তো কবির গানকে ওরকম সুন্দর সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারেন। ভদ্রলোক আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা নজরুলগীতি শিল্পী—অন্ধ কণ্ঠশিল্পী জুলহাস উদ্দিন আহমেদ।

প্রখ্যাত শিল্পী বেদারুদ্দিন আহমদ এবং সোহরাব হোসেন প্রতি ঈদেই কবিকে 'ঈদ মুবারক' জানাতে আসতেন। ফিরোজা বেগম, যিনি নজরুলের গান করে নাম কিনেছেন তাকে প্রথম দিকের মত শেষ দিকে কবির পাশে তেমন একটা দেখা যেত না। ফেরদৌসী রহমানকে মাঝে মধ্যে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যেত।

ঢাকার রাজনৈতিক নেতারা, গণ্যমান্য ব্যক্তি, লেখক-লেখিকা, শিল্পী যার কাছেই যেতাম, প্রত্যেকেই কবির সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করতেন। কিন্তু কবির পাশে কাউকেই বলতে গেলে দেখা যেত না। কবিকে দেখে আসতে বললে ভিন্ন কারণ ভিন্ন জনার মুখে শুনতাম। এই কারণগুলোর মধ্যে 'কি লোক কি হয়েছে–এ দৃশ্য দেখতে পারব না' কারণটাই বেশী উচ্চারিত লক্ষ্য করেছি। তবে আমার কাছে এই কথাটি বিশেষ ভাল লাগত না। এদের কার্যকলাপে

www.pathagar.com

মনে হয়েছিল কবির প্রতি যা করণীয় তা তারা করে ফেলেছেন। তাই কবি আসার পর তাদের হয়তো মনে মনে সাড়া জেগে থাকলেও বহিঃপ্রকাশ তা হয়নি। কবির ঢাকাতে আসার পর অন্তত লেখকবৃন্দ একত্রিত হয়ে সভা করে কবির রচনাবলীকে বিশ্বদরবারে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে পারতেন। তদানীন্তন সরকারের মনোভাবটাও যেন ছিল কবিকে শুধু নিয়ে এসে এদেশে হাজির করতে পেরেই হাসিল হয়ে গেছে সমস্ত। আর যেন কিছুই করণীয় তাদের ছিল না।

নজরুলের স্বাস্থ্য যে সময় পিজি হাসপাতালে দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল সে সময়ও আমি সবাইকে অনুরোধ করি কবিকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে। এমনকি সাংস্কৃতিক দফতরের উপদেষ্টা অধ্যাপক জনাব আবুল ফজল সাহেবকেও তার বেইলী রোডস্থ বাড়িতে গিয়ে জানিয়েছিলাম। তিনি আমায় পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন "নজরুলকে তো বাংলাদেশ সরকার এনেছে— তুমিতো আননি, তা 'তুমি কেয়ারটেকার' কি করে হলে? আর কবিকে নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?" এরকম অবাস্তব প্রশ্ন আমি আশা করিনি। যাই হোক অধ্যাপক সাহেব অবশ্য কবিকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নে একা-ডেমীগুলোকে একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে বলেছিলেন এবং কবি সম্পর্কিত সবই করেন প্রেসিডেণ্ট সাহেব—তাই তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানান। এক সময়ের নজরুল-বন্ধুর নজরুলের ব্যাপারে এমন ব্যবহারে অবাক হতে হয়। অবশেষে দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক শ্রী নির্মল সেন (অনিকেত) সমস্ত জেনে ২৬শে জুন ৭৬-এর দৈনিক বাংলায় 'বিদ্রোহী কবির ভবন' শিরোনামে একটা উপ-সম্পাদকীয় লিখলেন। এর ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বুলেটিন দু'দিন পর পর জানাবেন বলে জানালেন। দু'বার বুলেটিন দেয়ার পর আবার যেই-সেই। দু'মাস পর কবি হঠাৎ মারা গেলেন কিন্তু বুলেটিন বের হয়নি। শুক্রবার সন্ধ্যায় অসুখ করেছিল এবং রোববার সকাল দশটা দশ মিনিটের মধ্যে অন্তত রেডিও-টিভি কিম্বা পত্রিকাযোগে কবির জন্য মোনাজাত করার আহ্বান করা কর্তব্য ছিল—কিন্তু তা হয়নি।

পল্লী-কবি জসীমউদ্দিন একমাত্র ব্যক্তি যিনি কবিকে ধানমণ্ডির কবি ভবনে এসে একাধিকবার দেখে যেতেন। খুশী লাগত প্রচুর, বাংলার দুই শ্রেষ্ঠকে পাশা-পাশি দেখতে পেয়ে। কবি জসীমউদ্দিনকে দেখেছি ভীষণ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ধানমণ্ডির কবি ভবনের দোতলায় উঠে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতেন বহু কষ্ট করে। কিন্তু তবু তিনি আসতেন। কবি নজরুল যে তার জন্যে কিছু করেছিলেন হয়তো

www.pathagar.com

সে জন্য নয়তো অন্তরের তাগিদেই যেতেন। কবির নাতনীদের গানের তালিম দিই শুনে তিনি আনন্দ পেয়ে বলেছিলেন, "বাহ্ ! একি আমাদের কম গৌরবের কথা ! কবি নজরুলের নাতনীদের একজন বাংলাদেশের ছেলে তালিম দেয়—বেঁচে থাক বাবা।" পিজি হাসপাতালে কবি যখন ১১৭ নং কেবিনে কবি জসীমউদ্দিন সাহেবও তখন প্রায়ই "চেক আপ'-এর জন্যে পিজি হাসপাতালে অবস্থান করতেন এবং কাছাকাছি ১২১ নং কেবিনে থাকতেন। কবি নজরুলকে আমি পিজি হাসপাতালে প্রায়ই দেখতে যেতাম এবং সেই সাথে কবি জসীমউদ্দিনকেও দেখে আসতাম। আমায় দেখে খুশী হতেন। নজরুলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলাপ হত। বলতাম ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেবকে কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো দৃষ্টি রাখতে বলুন না ? জবাব দিতেন—যাওনা, তুমি বল। বলতাম 'জনাব ডাঃ নাজিমউদ্দৌলা চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা করি—কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেন—বুড়ো বয়স।' আমার কাছে এ জবাবটা ভাল লাগত না—কারণ কবি ভবন থেকে পিজি হাসপাতালে আসতেই কবি বুড়ো হননি। একদিন হাসপাতালের কেবিনের সামনের কারিডরে কবি জসীমউদ্দিন পায়চারী করতে করতে আমায় বললেন—তোমার নামে 'এলিগেশন' আছে। মনে মনে একটু অবাকই হয়েছিলাম, বললাম—বলুন। বললেন—তুমি নাকি টাকা পয়সা অযথা খরচ করেছ ? অনেক বাকী করেছ ? বললাম—কে বলেছে ? বললেন—ওরা বলে। বুঝলাম ওরা' কারা। বললাম—তবে একটু বলতেই হয়—উমাকাজী কবির জন্য আট প্যাকেট দুধ রাখতেন 'ওরা' সে খবর রাখেন নি। অথচ আমি বাকী করা দুধের টাকার ব্যাপারে সাভার ডায়রী ফার্মের সঙ্গে আলাপ করে টাকা ২৮৯৮.০০ যে বাকী পড়েছিল সে বাবদ ডেয়ারী এণ্ড ক্যাটেল ইমপ্রুভমেণ্ট ফার্মের ম্যানেজার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে যে পত্র দেন ১০ই জানুয়ারী '৭৫ তার জবাব মন্ত্রণালয় আমার সাথে স্থির করে ১৯শে জুন '৭৫ জবাব দেন যে বাকী টাকা প্রতিমাসের বিলের সঙ্গে ১৫০.০০ টাকা করে শোধ করা হবে। এবং এইমতে একবার মাত্র শোধ হবার পর কবি হঠাৎ চলে আসেন হাসপাতালে। আট প্যাকেট দুধ-এর পরিবর্তে আমি তিন প্যাকেট করে দুধ রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম যা শুধু কবির জন্যই ব্যবহৃত হত। সমস্ত ঘটনা জানানো হলে তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আমার প্রতি খুশী হয়েছিলেন কবিকে দেয় সরকারী টাকা থেকেই আমি শোধ করে যাব বলে রাজী হয়েছিলাম তাই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই কবি জসীমউদ্দিন জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি ঘটনা না জেনেই তাদের কাছে ঐ দুধের বিল যাওয়াতে এই 'এলিগেশন' উঠে-ছিল। অবশ্য আমি জনৈক পদস্থ হাসপাতাল কর্মচারীর সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে

www.pathagar.com

দুধের বিল সংক্রান্ত খবর জানতে পেরেছিলাম। কবির হাসপাতালে ভর্তির দিন চারের পর তদানীন্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী সাহেবের সাথে হাসপাতালে ১১৭ নং কেবিনে কবির পাশেই দেখা হওয়ায় আমার কাছে কবির যে টাকা রয়েছে তা দিয়ে কবির যা প্রয়োজন তা কিনে দেবার কথা বলেছিলেন। কিশোর সালু কুশার কাছে আমি প্রয়োজনীয় দু'একটা জিনিস পৌঁছে দিয়েছিলাম। সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী সাহেবের সাথে বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন পরিচালক জনাব ডঃ মোস্তফা নূরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন।

কবি নজরুলের ধানমণ্ডির ভবনের পুলিশ প্যাট্রলের একজন হাবিলদার—নাম নজরুল ইসলাম। কবির নামেই নাম এবং কবিকে খুব ভালবাসতেন। হাবিলদার নজরুল প্রায় ছ-সাত মাসের মত কবি-ভবনে কর্তব্যরত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কবিকে নিজ হাতে তৈরী করে একটা পুলওভার দিয়েছিলেন। সবুজ রঙের ফুলহাতা পুলওভারটি কবির গায়ে অনেকদিনই দেখা যেত। সামান্য বেতনের একজন সরকারী কর্মচারীর ভক্তি যে কত গভীর, তা হাবিলদার নজরুল ইসলাম প্রমাণ রেখেছেন।

কবিকে নিয়ে একদিন কবি-ভবনের সামনের লনে পায়চারী করছিলাম। এমন সময় একজন গাড়ীওয়ালা-ভক্ত কবিকে দেখতে এলেন। কবি এতক্ষণ লনের যে দিকটায় পায়চারী করছিলেন, গাড়ী দেখে সেদিক ছেড়ে আস্তে আস্তে গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। এবং ধীরে ধীরে কবি তাঁর কাঁপা হাতের ছাপ গাড়ীর দরজায় রাখলেন। কবির চোখের চাহনী তখন বলছিল 'কই, কেউ খুলে দিচ্ছে না কেন—গাড়ীতে চড়ব যে'। অবশেষে কবিকে নিয়ে আমি সরে এলাম অথচ গাড়ীওয়ালা ভক্তটির প্রাণে কবির কাঁপা হাতের গাড়ীর দরজা খোলার কম্পন এক মুহূর্তের জন্য দোলা দেয়নি।

১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখ নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্র বাহাদুর কার্কির বাংলাদেশ সফরের সময় সস্ত্রীক কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন কবির ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে এসে। কবিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিয়েছিলেন উপহারস্বরূপ তাঁর দেশ থেকে নিয়ে আসা এক বাক্স কমলা ও ফুলের তোড়া। মিঃ কার্কি ঐ দিন অপরাহ্নে প্রায় আধ ঘণ্টার মত কবির পাশে ছিলেন।

১৯৭৪ সালের ২৭শে মে আফ্রিকা মহাদেশের সেনেগালের প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার লিওপোল্ড সেডর সেনঘর বাংলাদেশ সফরে এসে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান ধানমণ্ডিস্থ কবি ভবনে দুপুরের দিকে। মিঃ সেনঘর নিজেও একজন কবি বলে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সফরকালে কবি নজরুলকে জেনেছিলেন এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। বিশ মিনিটের মত তিনি কবির পাশে ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৭ই এপ্রিল ভারতীয় কৃষি বিষয়ক স্টেট মন্ত্রী মিঃ কে. এন. সিং ঐ দিন অপরাহ্নে বিশ মিনিটের মত সময় কবির ধানমণ্ডিস্থ ভবনে এসে কবির সাথে কাটিয়ে যান। ভারতীয় কৃষি ও সেচ মন্ত্রী শ্রী জগজীবন রামের বাংলাদেশ সফরকালে তিনি তাঁর সাথে আসেন এবং কবিকে শ্রদ্ধা জানান।

দেখেছি অনেক বিদেশীদেরকে কবির পাশে। দেখেছি ভারত থেকে আগত নজরুলগীতি শিল্পীদেরকে কবির পাশে—ধীরেন বসু, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় ও আঙ্গুরবালাকে। দেখেছি রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। দেখেছি ডঃ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী কাজী, গীটার শিল্পী মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম, তদীয় ছাত্র বিশিষ্ট গীটার শিল্পী গোলাম মূর্তজাকে, আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী ইসলামকে। দেখেছি বাংলাদেশের চিত্র শিল্পী শর্মিলী, রাণী সরকার, গোলাম মোস্তফাকে। কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম, সাহিত্যিক জনাব শামসুদ্দিন চাকলাদার, গল্পলেখিকা বেগম সালেহা চাকলাদার, শিল্পী জুলহাসউদ্দিন আহমদ, সোহরাব হোসেন, বেদার উদ্দিন আহমদ, জোসেফ রড়রিকস, খালিদ হোসেন, শেখ লুৎফর রহমান, রাশেদুল হাসান মতিন, রেবেকা সুলতানা, পারভীন মুশতারী, ফাহিম হোসেন চৌধুরী, সাবিহা মাহবুব, কাদেরী কিবরিয়া, সিফাত-ই মঞ্জুর, ডালিয়া নওশিন, শিল্পী রফিকুল ইসলাম, তবলচী মোহাম্মদ হোসেন, আতিকুর রহমান এবং পরিতোষ সাহা প্রমুখকে।

১৯৭৩ সালে কবির ৭৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিলেন জাসদ নেতৃবর্গ—সম্ভবত মে মাসের ২৮/২৯ তারিখের দিকে। জাসদ নেতা আ. স. ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, মেজর জলিল এসেছিলেন।

কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে কৌতূহলী ভক্তরা জিজ্ঞেস করতেন, কবি কি কি খেতে ভালবাসেন। জবাবে তাদের বলতাম মিষ্টি, আম, কমলা, কলা, আনারস কবির প্রিয়। তবে ব্লাড প্রেসার ধরা পড়ায় সেই সাথে ডায়াবেটিস থাকায় 'মিষ্টি বন্ধ করা হয়। ডাইবেটিস ধরা পড়ে এখানে। তবুও মাঝে মধ্যে একজন ভক্তের একান্ত ভক্তিভরা দাবী রক্ষা করতে হত। তাদের সামনে অল্প মিষ্টি খেতে দেয়া হত। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৭৫ সালের ২৯ মে'র একটা ঘটনা উল্লেখ করছি—একজন ভক্ত কবিকে ছোট্ট একটা বাক্সে পাঁচটি সন্দেশ দেন। সন্ধ্যের পর কবিকে নিয়ে টিভি দেখার সময় সি এণ্ড বি থেকে নিযুক্ত দারোয়ান খালেককে সন্দেশের

www.pathagar.com

বাক্সটি কবিকে এনে দিতে বললাম। কবিকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হল কিভাবে খেতে হবে। অবশেষে কবির সামনে বাক্স তুলে ধরলে কবি নিজ হাতে একের পর এক সাধারণ সুস্থ মানুষের মত পাঁচটির প্রতিটি সন্দেশই খেয়ে নিলেন। খাওয়া শেষে বাক্সের দিকে চেয়েও ছিলেন, যেন বলছেন আরো দাও, আর নেই ?

বর্তমানের প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী সাবিহা মাহবুবের মা বেগম মাহবুবুল্লাহ্র কবি ভক্তির কথা উল্লেখ করার মত। তিনি আমার অনুমতি নিয়ে কবিকে প্রায়শই আম-আনারস ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন।

১৯৭৩-এর ২৪শে মে নজরুল জয়ন্তীর প্রস্তুতি চলছে। কবি ভবনে প্রচুর উদ্দীপনা। জানালার পর্দা তখনো কটা বাকী। রাতও নটা বেজে গেছে। পর্দার কাপড়ও নেই। গাড়ীও চলে গেছে। পরদিন জন্মদিন। উমা কাজী এবং আমি একটা রিক্সায় বেরিয়ে পড়লাম। জিপিওর উল্টো দিকের হকার্স মার্কেটের একটি দোকান তখনো খোলা ছিল। দোকানদার বৃদ্ধ—দোকানের অবস্থাও ভাল নয়। কয়েক থান পর্দার কাপড়ই সম্বল। আমাদের দশ গজের মত প্রয়োজন—প্রায় সোয়াশ' টাকার মত দাম—আছে মাত্র গোটা চল্লিশেক টাকা। অপরিচিত আমরা। কবি নজরুলের বাড়ীতে লাগবে—জেনেই সত্তর টাকা বাকী রেখেই দিয়ে দিল বৃদ্ধ। পরদিন টাকা দিতে গিয়েছিলাম। বৃদ্ধের এরকম কবিভক্তি মনে রাখার মত।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে জাপানী এক চিত্র প্রতিষ্ঠান দল নজরুলের উপর বিশ মিনিটের এক ডকুমেণ্টারী ফিল্ম তৈরী করে নিয়েছিলেন। ছোট্ট এই বিশ মিনিটের ডকুমেণ্টারী ফিল্মের শিল্পী ছিলাম আমরা—জোসেফ রডরিকস রাশেদুল হাসান এবং আমি। ছোট্ট একটা কাহিনীর মতই—যেমন রাস্তা ধরে হারমনিয়ম ধরে (রাশেদুল এবং আমি, সাথে জোসেফ) কবিকে গান শোনাতে যাচ্ছি। কবি ভবনের গেটে পুলিশ গার্ডের অনুমতি নিয়ে গেট খুলে চলে যাওয়া হল সোজা দোতলায়। সেখানে 'সেট' তৈরী ছিল। কবি এসে বসলেন চেয়ারে, আমরা তাঁকে পা ছুঁয়ে সালাম জানিয়ে গান করতে বসলাম। রাশেদুল হাসান হারমনিয়মে বসল এবং জোসেফ সহশিল্পী হিসেবে পাশে রইল এবং আমি তবলচীর অনুপস্থিতিতে তবলাতে সহযোগিতা করলাম। কারার ঐ লৌহ কপাট, দুর্গম গিরি কান্তার মরু গাওয়া হয়েছিল। ক্যামেরা সেট করা হয়েছিল প্রথমে গেটে—রাস্তা ধরে আসা ভক্তদের ছবির জন্য পরে কবির পাশে দোতলায়। আমাদের সে অনুষ্ঠান খুব ভাল হয়েছিল বলে জাপানী চিত্রদল জানিয়েছিলেন। এবং এই ডকুমেণ্টারী ছবিটি জাপানের দূতাবাসসমূহে পাঠানো হবে বলে তারা জানিয়েছিলেন আমাকে।

www.pathagar.com

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন কবির কাছে এসেছিলেন বেশ ক'বার। কবির সামনে গান করছিলাম শুনে তাঁর যেন গানের নেশা পেয়ে বসল। সোফা ছেড়ে উঠে আমার পাশে এসে বসে নজরুলের 'আমি এ কুসুম হার সহি কেমনে' গানটি গেয়েছিলেন এবং আমাকে গানটি শিখিয়েছিলেন। কবি নজরুলের সামনে এসে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন থেকে গান শিখে নেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯৭৪ সালের এপ্রিলের শেষে।

৭৩তম জন্মজয়ন্তী

নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে ১৯৭২ সালের ২৫শে মে বৃহস্পতিবার প্রথম-বারের মত বাংলাদেশে নজরুলের ৭৩তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছিল—বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ এবং হিজরী ১১ই রবিউসসানি ১৩৯২ সনে। খুব সকালে বৃষ্টিতে ভিজে কবিকে প্রথম শ্রদ্ধা জানাতে ধানমণ্ডির কবি ভবনে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা ক' ভাই। প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। বৃষ্টির পরিমাণ ৯.৮৬ ইঞ্চিতেই প্রমাণ রাখে কত বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। হঠাৎ মনে করিয়ে দিল সেদিন থেকে ৭৩ বছর পূর্বের কথা কবি যেদিন এসেছিলেন এ ধরণীতে। সেদিনেও প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল এবং বাংলাদেশেও কবির প্রথম জন্ম দিবসের প্রথম ক্ষণটিতেও প্রচুর বৃষ্টি ছিল। সে যাক্ আমরা যখন কবি ভবনে পৌঁছেছিলাম তখনও সাতটা বাজেনি ঘড়িতে। দেখলাম মঞ্চ তৈরীর জন্য একটা ভাঙ্গা চৌকি এবং আওয়ামী লীগের ব্যানারগুলো 'স্বাগতম কবি নজরুল' এক পাশে পড়ে আছে। বারান্দায় শুধু মাত্র আমরা ক'জন ছাড়া তখনো কেউ পৌঁছেনি—বৃষ্টির জন্যই মনে হয়। আটটার সময় কবি আসবেন সবার সামনে। ইতিমধ্যে কাজী সব্যসাচীকে দেখলাম কোমরে টার্কিশ টাওয়েল জড়িয়ে এসে চৌকিটার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন 'বাবার জন্য কি এটার ব্যবস্থা হয়েছে?' যাই হোক ঐ চৌকিটার কোন প্রয়োজন হয়নি সেদিন। ধীরে ধীরে বৃষ্টি মাথায় করে পত্রিকার ফটোগ্রাফাররা এবং সাংবাদিকরা একে একে এসে জড় হচ্ছিলেন। কবি নীচের তলার পেছনের রুমে রয়েছেন তা ইতি-মধ্যেই জেনে নিয়েছিলাম এবং আমরা চুপি চুপি ভেতরে গিয়ে কবিকে এক পলক দেখেও নিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগের ব্যানারগুলো এখানে সেখানে পড়ে আছে দেখে আমরাই টানিয়ে দিয়েছিলাম কবি যে রুমে দর্শন দেবেন সে রুমে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানালেন তদানীন্তন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সচিব জনাব মোস্তফা সরওয়ার এবং তার সাথে আরো ক'জন। সরকারী সীল না থাকাতে তাদের পরেই আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছিলাম। কবিকে পেছনের রুম থেকে সামনের রুম পর্যন্ত বলতে গেলে, একরকম পাঁজাকোলা

www.pathagar.com

করেই নিয়ে এসে সোফায় বসানো হয়েছিল। কবিকে প্রথম দেখছিলাম বলেও কবিকে প্রচুর অসুস্থতা তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। প্রচুর দুর্বল এবং কঙ্কালসার শরীর। পশ্চিম বঙ্গীয়দের কবিভক্তি এবং কবি বন্ধুদের ভালবাসার চরম নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। সে যাক্ ইতিমধ্যে কবিকে আনন্দ দেবার জন্য কবির সামনে হারমনিয়ম নিয়ে বসে গেছেন কবির দ্বিতীয় পুত্র মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী কাজী ও নজরুলগীতি শিল্পী ডঃ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়। একের পর এক গান চলেছে এবং ফটোগ্রাফাররা কবির প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরে রাখছিলেন। ফ্লাশের হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলো এবং নিভে যাওয়াকে যেন অন্ধকার রাতের অনেক জোনাকী পোকার জ্বলে ওঠা নিভে যাওয়ার মত মনে হচ্ছিল। কবিকে প্রথম দর্শনে গান শোনাবার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গলায় ঠাণ্ডা লাগার জন্য সে আর হয়ে ওঠেনি। প্রায় সকাল সাড়ে নটা নাগাদ আমরা একনাগারে কবিকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে চলে এসেছিলাম। এরপর বৃষ্টি এবং মেঘলা আবহাওয়া কেটে উঠতে শুরু করলে ভীড় বেড়ে যেতে শুরু হলে আমরাও কেটে পড়েছিলাম। এরপর দুপুর নাগাদ কবিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আগত দর্শক সংখ্যা এত হয়েছিল যে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক ভক্ত কবিকে প্রথমদিন শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। নজরুলকে জনগণ কতটা ভালবাসে তার নজির এর থেকে উৎকৃষ্ট আছে বলে জানা নেই। তৎকালীন সরকারের মন্ত্রীবৃন্দ তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী রেখে এসেছেন ফাঁকে ফাঁকে। এতবড় জনসমুদ্রের মধ্যে ছিল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, মালি, মুটে-মজুর। ছোট বড় অনেক শিল্পী তাদের কণ্ঠ দিয়ে আনন্দ দিয়েছেন কবিকে। কবি মাঝে মাঝে হেসেছেন-কেঁদেছেন সে গান শুনে। তবে কবির এই জন্ম দিনটির পরও প্রায় মাস খানেকের মত সময় ধরে লাইন করে ভক্তকুল কবিকে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়ে গেছেন। কবির উপস্থিতিতে কবির ৭৩তম এবং বাংলাদেশে এই প্রথম জন্মদিন পালন সারা দেশব্যাপী মনে যে সাড়া জাগিয়েছিল তেমনটি আর বাংলাদেশে কোনদিন দেখব বলে মনে হয় না।

৭৪তম জন্মজয়ন্তী

১৯৭৩ সালের ২৫শে মে এবং ১৩৮০ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুলের ৭৪তম জন্ম জয়ন্তী পালন হয়। দিনটি ছিল শুক্রবার। কবি ভবনে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আয়োজন শুরু হয়েছিল। তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে কবি ভবন সজ্জিত করা হয়েছিল। সজ্জিত করার একটি দিক ছিল সম্পূর্ণ কবি ভবনটি ডিসটেম্পার করা। ফার্নিচার

www.pathagar.com

যা প্রয়োজন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলো নতুন দেয়া হয়েছিল। জানালার পর্দা, সোফার কভার, বিছানার চাদর, বালিশ কাভার ইত্যাদির নতুন করণ কিম্বা পুরোনোগুলোকেই রং করে দেয়া তো ছিলই। এছাড়া কবি ভবনের সবুজ লনের উপর একটা মঞ্চ তৈরী হয়েছিল প্রথমবারের মত। ইলেক্ট্রিক্যাল যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে সমস্ত বাড়িটি আলোক-সজ্জিত করা হয়েছিল। মাইকের ব্যবস্থাও ছিল এবং মঞ্চের সামনে হাজার খানেক চেয়ারের ব্যবস্থাও ছিল। কোন ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি ছিল সব সময়। জন্মদিনের সকাল থেকেই ধীরে ধীরে কবি ভক্তরা কবিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এসে জমায়েত হয়েছিলেন। কবি সকাল আটটার সময় ভক্তদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। কোলকাতা থেকে এসেছিলেন কবির বড় ছেলে কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং ছোটছেলে মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম। মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ এসেছিলেন তার গীটার পার্টিসহ এবং তিনি তাঁর পার্টিসহ স্থানীয় পূর্বাণী হোটেলে ছিলেন। উল্লেখ্য, এটাই ছিল অনিরুদ্ধর শেষ আগমন এদেশে—শেষবারের মত তার বাবা কাজী নজরুলের সাথে দেখা যায়—কারণ এর পর ৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। কোলকাতা থেকে অন্যান্যের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবৃত্তিকার মিনতি দে। তিনি স্বামী-পুত্রসহ এসেছিলেন, আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ, কবির ছাত্রী শিল্পী রেণু (বসু) ভৌমিক, কবির ভ্রাতুষ্পুত্র চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর সেক্রেটারী জনাব কাজী মজহার হোসেন, গত বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ কবির চাকর কিশোর সালু কুশা। কবির মৃত্যুর পর সংবাদপত্রগুলো ভুল রিপোর্ট দিয়েছিল যে কবি বাংলাদেশে যখন এসেছিলেন কুশাকেও সাথে এনেছিলেন। কাবিয়া বলে একজন তিনিও কবির সাথে প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ ছিলেন এবং কোলকাতায় তখনো কবি পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী ধীরেন বসু, কবির প্রিয় কণ্ঠশিল্পী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। অবশ্য মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ এবং ধীরেন্দ্র বসু ও ধীরেন মিত্র ছাড়া সবাই কবিভবনের অতিথি হয়েছিলেন। তবে জন্মদিনে অন্যান্যের মত কবিকে শ্রদ্ধা এবং গান শুনিয়ে আনন্দ দিতে মোটেও ভুল হয় নি। আমায় সহযোগিতা করার জন্য জন্মদিনের আগের রাত থেকে ছিলেন এদেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং নৃত্যপরিচালক এবং অভিনেতা কবির একনিষ্ঠ ভক্ত আমির হোসেন বাবু। সম্পূর্ণ বাড়িটায় বিরাট আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। কবিকে কবি-পরিবারের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গীয় অথবা হিন্দুমতে চন্দনপ্রলেপ কপালে দিয়ে, পায়েস দিয়ে মিষ্টি মুখ করার পর সকাল আটটার সময় হাজির করা হয়েছিল নীচের তলার সামনের রুমটিতে। এ কক্ষতেই সারাদিন দর্শনার্থী ভক্তদের সামনে হাজির

www.pathagar.com

ছিলেন। জন্মদিনের আগের দিন থেকে কবি নীচের তলার পেছনের রুমে ছিলেন এবং জন্মদিনের পরদিনই আবার তিনি তাঁর নিজস্ব ওপর তলার কক্ষতে চলে যান। ফিরোজা বেগম, নীলিমা দাসসহ অন্যান্য অগণিত ছোট-বড় শিল্পী কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলীসহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আপামর জনসাধারণ কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতও তাঁর শ্রদ্ধা রেখেছেন এসে। এ দিনও দুপুরের দিকে কিছু বৃষ্টি হয়েছিল। তবে তাতে কোন অসুবিধের সৃষ্টি হয়নি। এবং এমনিভাবে কবির ৭৪তম জন্মদিন আনন্দ এবং উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। এইদিনই সকাল আটটায় আধঘণ্টার জন্য কবি প্রথমবারের মত বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে কবির এই প্রথম কবিভবন ছেড়ে বাইরে গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান—এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা রয়েছে।

৭৫তম জন্মজয়ন্তী

১৯৭৪ সালের ২৫শে মে, ১৩৮১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবির ৭৫তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। দিনটি ছিল শনিবার। গেল দু'বছরের মত সেবারেও তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কবি ভবন সজ্জিত করা হয়েছিল। কবি ভবনের লনে একটি সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরী হয়েছিল। কবি ভবনের গেটে একটি সুসজ্জিত তোরণও প্রথমবারের মত নির্মিত হয়েছিল এবং ২৮ নং রোডের সঙ্গে ৩৩নং রোডের সঙ্গমস্থলেও একটি তোরণ নির্মিত হয়েছিল। পুলিশদের জন্য একটি স্থায়ী গার্ড রুমও তৈরী হয়েছিল। সম্পূর্ণ ভবন ডিস্টেম্পার করা হয়েছিল। ফার্নিচার এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থাও হয়েছিল। সেবারে কবি ভবনের নিজস্ব কোলকাতার অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং কবির দ্বিতীয় ছেলে মরহুম কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের স্ত্রী শ্রীমতি কল্যাণী কাজী এবং তার বড় ছেলে অনির্বাণ কাজী ওরফে গুবু এবং কবির ছাত্রী শ্রীমতী রেণু (বসু) ভৌমিক। ৭৫তম জন্মজয়ন্তীর সুপ্রভাতে কবিকে পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুমতে কপালে চন্দন প্রলেপ দিয়ে, পায়েস দিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে সকাল আটটার সময় ভক্তদের সামনে হাজির করা হয়। কবিকে ভক্তদের সামনে উপস্থিত করাবার পর তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য প্রথমে হারমনিয়ম নিয়ে গান শোনালেন শ্রীমতী কল্যাণী কাজী, রেণু ভৌমিক, খিলখিল কাজী এবং আমি। তবলায় বরাবরের মত ছিলেন কবি ভবনের নিজস্ব তবলাবাদক,

www.pathagar.com

রেডিও বাংলাদেশ থেকে নিযুক্ত পরিতোষ কুমার সাহা। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিমন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, মহিলা শিশুসহ দেশের নানা স্থান থেকে আগত আপামর জনসাধারণ কবিকে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ তাদের কণ্ঠ দ্বারা কবিকে আনন্দ দিয়েছেন। তবে সেবার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখা যায়নি কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে—দলীয় এক সদস্যার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করাতে আসেন নি—তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রাজনৈতিক বিষয়ক সচিব জনাব তোফায়েল আহমদ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তবে এই দিনের একটি ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়। জন্মদিনের উৎসবাদি তখন প্রায় সমাপ্ত, রাত প্রায় সাড়ে আটটার মত এমনি সময় কবি নজরুলের প্রিয় ছাত্রী নজরুলগীতির অবিস্মরণীয় কণ্ঠশিল্পী শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবী কোলকাতা থেকে এসেছিলেন কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। তিনি অবশ্য এসেছিলেন স্থানীয় নজরুল একাডেমীর অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশনের জন্য। এখানে এসে প্রথমেই নজরুলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার সুযোগ হারান নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কবির বন্ধুবলে স্বীকৃত এবং দাবীকৃত অনেক নামকরা সাহিত্যিক কোলকাতা থেকে ঢাকায় এসে কিছুদিন অবস্থান করেও নজরুলকে এক পলক দেখার সুযোগ পেয়ে ওঠেন নি। এ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটি প্রামাণ্য চিত্র তুলে রেখেছিলেন—প্রামাণ্য চিত্রের উদ্দেশ্য ছিল কবি তাঁর সময় কি করে কাটান। সারাদিনব্যাপী এ চিত্র তোলা হয়েছিল। কবির সাথে কবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও প্রামাণ্য চিত্রে ছিলেন। উল্লেখ্য, এই জন্মদিনই কবির শেষ জন্মদিন এবং কবি এ জন্মদিন আত্মীয়দের সাথে পালন করেন। কারণ, এরপর উমাকাজী রিজিয়া বেগমে পরিণত হয়ে জনৈক ব্যক্তিকে বিয়ে করে বেরিয়ে যান এবং নাতি-নাতনীরা চলে যায় কোলকাতায় পূজো দেখার উপলক্ষে এবং ফিরে আসার কথা থাকলেও তাদের মা এখানে বিয়ে করার তারা আর এখানে ফিরে আসেন নি।

১৯৭৫ সালের ২৫শে মে, বাংলা ১৩৮২ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার কবি নজরুলের ৭৬তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। কবি, তাঁর পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছিলেন এবং আমার সৌভাগ্য যে কবি নজরুলের এ নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী ছিলাম এবং এ জন্মজয়ন্তীর ভারও সম্পূর্ণ আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। সকলের দোয়ায় আমি ত্রুটিহীনভাবেই জয়ন্তী পালন করতে পেরেছিলাম বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। সবচাইতে আশ্চর্য লেগেছিল

www.pathagar.com

আমার কাছে ওটাই যে, কোলকাতা থেকে কবি পরিবারের কেউই কবির পাশে এসে কবিকে এই শুভদিনে আনন্দ দেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। ১৯৭৪ সালের ২১শে অক্টোবর কোলকাতায় পূজো দেখার জন্য প্রতিবারের মত কবি নাতি-নাতনীরা চলে যায়। কাজী সব্যসাচী নভেম্বরের ২০ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত এবং জানুয়ারী '৭৫-এর ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। এরপর কবির আত্মীয় বলতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমীর সেক্রেটারী জনাব কাজী মজহার হোসেন ব্যক্তিগত কারণে ১৯৭৫ সালের ১৫ থেকে ২৩শে মে পর্যন্ত ঢাকায় কবি ভবনে অবস্থান করেছিলেন। আর কোন আত্মীয়-স্বজনকে কবির মৃত্যু পর্যন্ত কবির পাশে দেখা যায়নি। যাক, প্রতিবারের মত সেবারেও কবি ভবন সজ্জিত করা হয়েছিল তদানীন্তন সরকারের গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে। সজ্জিত করার মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ কবি ভবন ডিস্টেম্পার করা, একটি মঞ্চ কবি ভবনের লনে—মঞ্চের সামনে চেয়ারের বন্দোবস্ত এবং মঞ্চে মাইকের ব্যবস্থা ছিল, একটি গেইট কবি ভবনের মুখে, এবং কবি ভবনের চত্তরে সুন্দর নকশা আঁকা হয়েছিল। এছাড়া পর্দাসমূহ রং করা হয় এবং কবির বিছানার ফোম নতুন করে দেয়া হয়। সারা রাতব্যাপী আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলতে গেলে কবির জন্মজয়ন্তীর সাজ-সজ্জায় কোন খুঁত হয়নি।

জন্মজয়ন্তী শুরু করেছিলাম 'ফজর ওয়াক্তে' কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এবং কবি যে কক্ষটিতে সারাদিন বিশ্রাম নেবেন সেই রুমেই এই কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেছিলাম। জন্মদিনে কবিকে নতুন পাজামা-পাঞ্জাবীতে সেই সাথে মাথায় ঢাকাই কিস্তি টুপীতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখানে উল্লেখ করতে হয় কবির এই সুদীর্ঘ অসুস্থ অবস্থার জন্মদিনগুলোর মধ্যে এই প্রথম-বারের মত কবির ধর্মমতে তাঁর জন্মদিনের শুভারম্ভ হয় এবং সেটা আমার মাধ্যমে হয়েছে বলে আমি গর্বিত। মাথায় টুপী পরিহিত কবিকে এর আগে দেখা যায়নি। কবিকে তাঁর জন্মদিনের পোশাকে সজ্জিত করানোর সময় কবি ভবনের কাছেই অবস্থানরত কবির ছাত্রী শ্রীমতী রেণু (বসু) ভৌমিক এসেছিলেন চন্দন প্রলেপ দেয়ার জন্য। আমি বারণ করেছিলাম বলে কবির কপালে সেই প্রথম বারের মত চন্দন প্রলেপ পড়েনি। হয়তো তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন কিন্তু তাছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। এরপর কবিকে কুরআন তিলাওয়াত যে কক্ষে হচ্ছিল সেখানে নেয়া হয়েছিল এবং কবির উপস্থিতিতে কবির জন্য দোয়া এবং মুনাজাত করার পর কবিকে জন্মদিনের প্রথম গান শুনিয়ে আনন্দ দিই আমি নিজে। এরপর কবি ভবনের লনে সজ্জিত মঞ্চে কবিকে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগতরা একে একে কবিকে গান, আবৃত্তি ইত্যাদি শুনিয়ে আনন্দ দেন। সকালের পর্বে তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জনাব শেখ মজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জনাব তোফায়েল আহমেদ কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যান। অন্যান্যের মধ্যে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সেক্রেটারী জনাব মোস্তফা সরোয়ার। রাতে এসেছিলেন তদানীন্তন রেডক্রস প্রধান জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা। কোলকাতা থেকে ঢাকার নজরুল একাডেমীর নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে আগত প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী শ্রী শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রী অধীর বাগচী, নজরুল একাডেমীর সচিব জনাব তালিম হোসেন, ফিরোজা বেগম ও তার ছাত্রীবৃন্দ, যোসেফ রডরিকস, রাশেদুল হাসান মতিন, রেবেকা সুলতানা, সোহরাব হোসেন, সালমা সুলতানা, সাবিহা মাহবুব, পারভীন মুশতারী, লায়লা আর্জুমান্দ, বেবী এবং তবলায় পরিতোষ কুমার সাহা এবং আমি কবিকে সারাদিন আনন্দের মধ্যে রেখেছিলাম। এছাড়া প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল কবি ভবনে এ দিনের অনুষ্ঠানে। অসংখ্য ভক্তের আগমন ঘটেছিল যারা কবিকে বিভিন্ন সময় শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। ঢাকার প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও সুদূর মানিকগঞ্জ থেকেও সেখানকার একাডেমীর শিল্পীরা কবিকে জন্মদিনে গান গেয়ে আনন্দ দিয়ে গেছেন। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমি ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করেছিলাম এবং মাত্র পাঁচজন ভলান্টিয়ারের একান্ত পরিশ্রম অনুষ্ঠানটিকে সুশৃঙ্খল করতে বাধ্য করেছিল। এদের সহযোগিতা চিরদিনের জন্য মনে থাকবে—এরা হচ্ছেন শরীফউদ্দিন চাকলাদার, স্বপন, সাইদউদ্দিন চাকলাদার, আবদুল খালেক এবং মুজিবর রহমান। সকালে কবি ১১টা পর্যন্ত এবং বিকেলে কবি ৪টা থেকে রাত ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত মঞ্চে ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর এত দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠানে কবি আর উপস্থিত ছিলেন না। ঘটনাক্রমে কবির পছন্দনীয় পরিবেশে এবং সঙ্গীত মুখরতায় ওটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ জন্মজয়ন্তী।

৭৭তম জন্মজয়ন্তী—হাসপাতালে

১৯৭৬ সালের ২৫শে মে, ১৩৮৩ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কবির ৭৭তম ও শেষ জন্মজয়ন্তী (জীবিতাবস্থায়) পালিত হয় না বলে অতিক্রান্ত হয় বললেই উপযুক্ত হয়। ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে এই জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালের ১১৭ নং কেবিনের সামনে যখন পৌঁছেছিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা হয়েছিল। কেবিনের সামনে মোটামুটি বিশ-ত্রিশজনের

www.pathagar.com

ভিড় লক্ষ্য করলাম যারা কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেবিনের ভেতর যেতে অনুমতি দিচ্ছিল না। তারা কি করবেন সে সিদ্ধান্তে তখনো পৌঁছতে পারেন নি। উল্লেখ করতে হয় কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে নজরুল একাডেমীর পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভের জন্য আমি প্রায় সপ্তাহখানেক ঘুরেছিলাম। অবশেষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুমতি পত্র পেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সামান্য কয়েকজনকে অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন—হাসপাতালে কবিকে শুধু মাল্যদান এবং যদি সে রকম ব্যবস্থা থাকে তবে হামদনাত শোনাবার কর্মসূচী নজরুল একাডেমীর ছিল। এটার উল্লেখ থাকতেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কবির অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে জন্মদিনটিতে যে গান শুনবেন তারও অনুমতি দিতে দ্বিধা করছিল। আরো উল্লেখ করতে হয় আমি একবার কবিকে গান শোনাবার অনুমতি চাইলে ডাঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী সাহেব আমাকে হাসপাতাল সুপার জনাব ডাঃ এ. আর. খানের কাছে যেতে বললে সেখানে গিয়ে জানলাম আমাকে 'এপ্লিকেশন' করতে হবে; শুনে চলে এসেছিলাম। এপ্লিকেশন করে গাইবার অনুমতি পেলে হাসপাতাল প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ নয়—আর যদি একজন শিল্পী গান কবিকে শোনাতে পেরেছেন বলে যে অন্যান্য শিল্পীরা ছুটে আসবেন কবিকে গান শোনাতে, সে ধারণা একদম ভুল। কবি ভবনে কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেবার পুরোপুরি পরিবেশ এবং সে পরিবেশে গান শোনাতে দাওয়াত-পত্র দিয়েও কবির পাশে সামান্যতম সময় যে শিল্পীরা কবিকে আনন্দ দেবার জন্য কাটাতে সময় করে উঠতে পারেন নি তারা হাসপাতালে যেতেন কবিকে গান শোনাতে? আজগুবি কল্পনা। ভীষণ দুঃখ লেগেছিল বলে এপ্লিকেশন করিনি—কারণ, এই গান শুনিয়ে বা অন্যান্য পরিবেশ সৃষ্টি করে কবিকে আনন্দ দেবার ব্যবস্থা আমার থেকে বেশী কেউ করেন নি, আর আমাকে গান শোনাতে হবে এপ্লিকেশন করে? পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টেপ-রেকর্ডারের মাধ্যমে গান শুনিয়ে কবিকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, যে সঙ্গীতে কবি মোটেও আনন্দ পেতেন না, শিল্পীর পারফরমেন্স নেই বলে। তাই এ পদ্ধতিতে কবিকে গান শোনানোর চেষ্টা ভুল পদক্ষেপ। যাহোক আমি কেবিনের সামনে পৌঁছলে সামান্য ভিড়ের মধ্যে তালিম হোসেন; নজরুল একাডেমীর সেক্রেটারী এবং শাহাবুদ্দিন আহমদ—নজরুল সমালোচককে দেখতে পেয়েছিলাম। কেবিনে ঢুকলে আমি দেখতে পেয়েছিলাম ছোট্ট কক্ষটিতে ৪/৫ জন ক্যামেরাম্যান, কয়েকজন ডাক্তার যার মধ্যে পিজি হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ নূরুল ইসলামও ছিলেন। ডাঃ ইসলাম সাহেব জনৈক ক্যামেরাম্যানকে কবির সাথে তার ছবি তুলে দেবার জন্য

www.pathagar.com

বলছিলেন, তবে উক্ত ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরাতে অসুবিধে ছিল বলে ফটো তোলা সম্বব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে কবিকে নীচের তলায় 'হল কামরা'তে নিয়ে যাবার অনুমতি হল এবং ডাঃ ইসলাম বেরিয়ে গেলেন। কেবিনে সে সময় একজন ব্রাদার আবদুল ওয়াহিদ ভূঞা এবং দু'জন ক্যামেরাম্যানসহ আমি ছিলাম। কবির প্রস্রাব করে ভিজিয়ে দেয়া কাপড় শেষবারের মত নিজ হাতে পাল্টিয়ে ছিলাম। এর পর ব্রাদার ভূঞা এবং আমি কবিকে নিয়ে নীচে 'হল কামরাতে' চলে যাই। সেখানে যারা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী ফিরোজা বেগম, শিল্পী বেদার উদ্দিন আহমেদ, জোসেফ রডরিকস, সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আজিজুর রহমান এবং শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। ত্রিশ মিনিটের মত কবি সেই হল কামরাতে ছিলেন এর পর ১১৭নং কেবিনে। কবি একটি হুইলচেয়ারে বসেছিলেন এতক্ষণ। উল্লেখ্য, কবি জন্মেছিলেন ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে, বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ—দিনটি ছিল মঙ্গলবার এবং কবির শেষ জন্মদিনটি ছিল ১৯৭৬ সালের ২৫শে মে এবং ১৩৮৩ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, হিজরী ২৫শে জমাদিউল আউয়াল ১৩৯৬ মঙ্গলবার। উল্লেখ্য, কবি তাঁর শেষ জন্মদিনে কোন গান শুনতে পাননি—যা অনায়াসে কর্তৃপক্ষ ঐ হলকামরায় ত্রিশ মিনিটে করতে পারতেন। যাই হোক কবির জীবনের শেষ জন্মদিনটি এভাবেই নিরানন্দ পরিবেশে কাটান।

কয়েকটি কথা

শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখেছি কবিকে নানান শ্রেণীর নানান বর্ণের লোক-দির। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, বই, ফল, মিষ্টি শ্রদ্ধাভরে দিয়ে গেছেন কবিকে। এদের মধ্যে কেউবা নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন, কারো বা কপোল ভিজেছে চোখের পানিতে—আলতো করে মুছে ফিরে গেছেন তাদের নির্দিষ্ট চলার পথে। সেই ৭০ বছরের বৃদ্ধ যাকে দেখেছি কবির পায়ের তলার মাটি শ্রদ্ধা ভরে মেখে নিতে। কবির পাশে এসে শ্রদ্ধায় তারা মাথা নুইয়ে গেছেন। কিন্তু কই নির্বাক কবির ভেতর কখনো কোন আলোড়ন হয়নি তো মুহূর্তের জন্য'?—সেই বড় বড় চোখের উদাস অথচ প্রখর চাহনি নিয়ে কখনো দেখা গেছে কবিকে হাসতে আবার কখনো দেখা গেছে নীরবে কাঁদতে, তাঁর এই হাসি-কান্না দেখে সবাই খুশী হয়েছেন। হয়তো কেউ মনে মনে আউড়িয়েছেন 'আহা যদি সেই লেখা পাওয়া যেত?' কত দীর্ঘশ্বাস আপনি এসেছিল কত জনার মধ্যে। শিল্পীদের গাওয়া গান কবি শুনেছেন—সে গান শুনে কবির মন দুলেছিল হয়তো। মানুষ জন্মালেই একটি চিরসত্যের পরিসমাপ্তির পথে পা

www.pathagar.com

বাড়ায় তা হচ্ছে মৃত্যু। নজরুল যেদিন জন্মেছিলেন সেদিনও তাঁর জন্য এই চির সত্যের পথটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের ২৮,২২১ বার সূর্যোদয়ের মধ্যে ১৫,৭৫২ দিন কেটেছে সুস্থাবস্থায় এবং ১২,৪৬৯ দিন কেটেছে অসুস্থাবস্থায়—যার মধ্যে ৪০১ দিন কেটেছে সম্পূর্ণভাবে কবির অপছন্দনীয় পরিবেশে। কবি যে পরিবেশ চেয়েছিলেন সেই পরিবেশই পেয়েছিলেন ধানমণ্ডি কবিভবনে।

শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম ছুটে। পিজি হাসপাতালের 'হল' কক্ষে শায়িত ছিল কবির লাশ। লাইনে দাঁড়িয়ে এগুচ্ছিলাম—আমাকে লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়ে টিভি প্রযোজক কাজী আবু জাফর সিদ্দিক আমায় ডাকলেন কবির লাশ যেখানে ছিল সেখানে তার পাশে আসতে। কিন্তু পুলিশের বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাঁকে এতটা যত্ন করেছিলাম তাঁকে লাইনে থেকেই দেখে এলাম। অথচ লাশের আশে-পাশে কয়েকটি পরিচিত মুখ দেখেছিলাম—যাদের অনেককে অনুরোধ করেও কবির পাশে দেখতে পারিনি অথচ সেদিন ঠিকই চলে এসেছিল।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিকেল সাড়ে চারটায় জানাজায় শরীক হয়েছিলাম। পিজি হাসপাতালের 'হল' ঘরে শায়িত কবির লাশের পাশে যেমন ভিড় দেখেছিলাম, এরপর সেখান থেকে লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন প্রাঙ্গণে। সেখানেও জনতার বিশাল লাইন দেখা গেছে কবিকে শেষ নজর দেখার জন্যে। এরপর লাশ জানাজার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানেও জানাজায় শরীক হতে বিশাল জনতার উপস্থিতি ঘটেছিল। রমজান মাসের ইফতারের তাড়া না থাকলে এবং জানাজার আয়োজন একদিন পর হলে জনসমাগম আরো অনেক গুণ বেড়ে যেত নিঃসন্দেহে। জানাজায় মাত্র একটি মাইকের ব্যবস্থায় বহুলোক বুঝতেই পারেনি জানাজা কখন শুরু এবং শেষ হল। এত তাড়াহুড়ার কি দরকার ছিল? জানাজা হয়ে যাবার পরও বহু লোকের আগমন লক্ষ্য করা হয়েছিল। এরপর দাফনের জন্যে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে। যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কবি।

ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পর কবিভবনে যারা কবিকে একান্ত যত্ন করে সেবা করেছেন তাদের নাম উল্লেখ না করলে আমার এ লেখার কোন মূল্য থাকবে বলে মনে করি না। এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করছি। বাংলাদেশে আসার পর বেশ কজনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এসে ডিউটি করে গেছেন। এঁদের মধ্যে সবাই মনোযোগী ছিলেন না। অল্প যে কজন আমার চোখকে ফাঁকি

www.pathagar.com

দিতে পারেন নি শুধু তাঁদের নামই উল্লেখ করব। প্রথম উল্লেখিত জনের নাম আবদুল খালেক—সি এণ্ড বি থেকে দারোয়ান হিসেবে কবি ভবনে নিযুক্ত ছিলেন। দারোয়ান হিসেবে কবি ভবনে কবি আসার প্রথম থেকে ছিলেন। দারোয়ান হিসেবে নিযুক্ত থেকেও দেখেছি কবির প্রতিটি কাজের জন্য কত আগ্রহ। মনে পরে ঢাকা মেডিকেল থেকে নিযুক্ত আয়া আম্বিয়া খাতুনের কথা। কবি ভবনে কবির ডিউটি করতে বহু দূর থেকে তিনি আসতেন। মাঝারি বয়সের এই গরীব মহিলা কবির কিছুতে অসুবিধে হোক তা একদম চাইতেন না। কৌটায় করে নিয়ে আসা পান খেতেন আর কবির কাজে সবসময় মন রাখতেন। পরবর্তী উল্লেখিত নাম আবদুল জলিল—ইনিও ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে কবির ডিউটিতে নিযুক্ত ব্রাদার। কবির যত্নের প্রতি তার প্রচুর আগ্রহ লক্ষ্য করার মত। ইনি আমাকে প্রচুর সহায়তা করেছেন—যাতে কবির কোনরূপ অসুবিধে না হয় তার জন্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে অপর একজন নার্সের কথা কোনদিন ভোলার নয়। নাম বিনীতা রায়। প্রত্যহ ডিউটি দিতে কোনদিন মহিলার ভুল হত না। কবির জন্য মহিলার প্রচুর দরদ লক্ষ্য করা গেছে। এরপর বলা যায় সি এণ্ড বি থেকে নিযুক্ত অপর এক দারোয়ান। নাম মুজিবর রহমান। কবির জন্য কতভাবেই না কষ্ট করেছে এই লোকটি। এরপর নাম করতে হয় কবির সাথে কোলকাতা থেকে আসা শামসুদ্দিন ওরফে দুলাল নামক এক যুবকের। অবশ্য এই দুলাল ন'মাস পরই ফিরে চলে যায় কোলকাতায়, নিজের দেশে নিজস্ব তাগিদে। কিন্তু কবির জন্য কষ্ট করতে লক্ষ্য করা গেছে। এরপর নাম বলতে হয় কিশোর সালুকুশা'র। কবি বাংলাদেশে আসার একটি বছর পর অর্থাৎ '৭৩ সালের কবির ৭৪তম জন্মজয়ন্তীর একদিন পূর্বে এই কুশা কোলকাতা থেকে সড়ক পথে ঢাকায় আসেন। কবির সাথে বিয়াল্লিশ বছর ছিলেন। এখানে এসেও বয়স্ক লোকটি প্রচুর খাটতেন। প্রচুর চা এবং আফিম খেতেন। প্রত্যহ অন্তত আড়াই টাকার আফিম না খেলেই নয়। একা একা বিড় বিড় করার অভ্যেস ছিল। কবি অসুস্থ হলে শোকে তিনিও এক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বাড়ি-ঘরের কোন খোঁজ-খবর ছিল না। তবে তিনি উড়িষ্যার লোক। নিঃস্বার্থ সেবক। এর একটি সাক্ষাৎকার '৭৫ সালে কবির জন্মজয়ন্তীর সময় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার থাকার ব্যবস্থাও কবির সাথে কবির রুমেই হয়। কবির মৃত্যুর পর পিজি হাসপাতালের সঙ্গেই জড়িত থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই তাঁর মরদেহের সৎকার করেছেন। এই কুশার সঙ্গে একই সময় কাঠিয়া নামক

www.pathagar.com

কবির আর এক ভৃত্যও এসেছিলেন কোলকাতা থেকে। তবে দু'মাস থাকার পর এই কাঠিয়া আবার কোলকাতা চলে গিয়ে সেখানে সি আইটি ফ্ল্যাটে সব্যসাচীর গৃহে থাকেন। সবশেষে উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য বিভাগ যখন কবির নামে তাদের তরফ থেকে গাড়ী বরাদ্দ করেন সে সময় রুস্তম খাঁ নামক এক ড্রাইভার নিযুক্ত হয়। এই রুস্তম খাঁকে দেখেছি গাড়ী করে কবিকে আনন্দ দেয়ার জন্য কত আগ্রহী। কবি গাড়ীতে চড়তে আনন্দ পান—তাই তার এ আগ্রহ। উপরের বর্ণনাকৃত সহযোগীরা ছাড়া কবিকে এতটা সুস্থ করে তুলতে পারতাম না।

আর আমার কথা বলতে গেলে আমার সেবার বিনিময়ে আমি কোন টাকা-পয়সা নেইনি। কবি পরিবার চলে যাবার পর কবির টাকা যাতে আমার জন্য ব্যয় না হয় সে জন্য আমি আমার রামপুরাস্থ বাড়ি থেকে দুপুরের এবং মাঝে মধ্যে রাতের খাওয়াও খেয়ে আসতাম। এ জন্য আমার বাড়ি থেকে একটা সাইকেল ব্যবহার করতাম, যা দিয়ে আমাকে কবির দায়িত্ব সম্পাদন করতে হত বিভিন্ন স্থানে গিয়ে। একজন অসুস্থ কবির জন্য আমার কোন ফোন দেয়া হয়নি। কবি গাড়ীতে চড়তে ভালোবাসেন সেটা জেনেও অন্তত এক ঘণ্টার জন্য একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়নি সে সময়টায়। বাংলা একাডেমীর পাঁচশত এবং সরকারের থেকে এক হাজার টাকাই ছিল আমার সাহস উদ্দীপনার জন্য একাগ্রতা। ভারতীয় তিনশত টাকা কবি পরিবার চলে যাবার পর তোলা হয়নি। কবি ভক্তদের দোয়া ছিল আমার অনুপ্রেরণা। কবি আবদুল কাদির, কবি আজিজুর রহমান, কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিন, জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের, জনাব সুফী জুলফিকার হায়দার, জনাব ব্যারিস্টার (এখন বিচারপতি) মোস্তফা কামাল, কবি বে-নজীর আহমদ, জনাব ফজল-এ-খোদা, কবি তালিম হোসেন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, তদানীন্তন শিক্ষা সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব আশরাফুল আলম প্রায়ই কবিকে দেখে যেতেন, খবর নিতেন কবি কেমন আছেন।

পিজি হাসপাতাল—১১৭ নং কেবিন এবং প্রসঙ্গ কথা

পি'জি হাসপাতালে কবিকে কেন নিয়ে আসা হয়েছিল এবং কি কারণ সেটাই হচ্ছে আমার এ প্রসঙ্গ। এ আলোচনায় আসতে হলে প্রথমেই বলব উমাকাজী যদি বিয়ে করে অন্যত্র চলে না যেতেন তাহলে কবিকে হাসপাতালে আসতে হত না। কারণ, কবি পরিবার কবির সঙ্গে আছেন সেটাই যথেষ্ট। কবি পরিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিব কাজী সব্যসাচীকে কবিকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছিলেন। সব্যসাচী সময় চেয়েছিলেন এবং ফিরিয়ে নেয়ার মানসিকতাও তখন তার ছিল না। শেখ মুজিব তাকে দু'মাস সময়

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন—সে হিসেবে '৭৫-এর জানুয়ারীতে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথাও। শেখ মুজিব উমাকাজী ওরফে রিজিয়া মালিককে কবিভবন ত্যাগ করতে আদেশ করেছিলেন। এ আদেশ ন্যায়সঙ্গত ছিল। কারণ আর কিছুই ছিল না। আর তাছাড়া কোলকাতায় কবির সেবা বাংলাদেশে বয়ে আনা স্বাস্থ্যতেই কিছুটা আঁচ করা গিয়েছিল। অবশ্য সিআইটি ফ্ল্যাটের ছোট্ট পরিবেশ এর কারণ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ঢাকায় কবি যখন এসেছিলেন তখন তাঁর কোমরে এবং পিঠে বেশ ঘা (BEDSORE) ছিল। কবির আগমনের পর পিজি হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ডঃ ইউসুফ আলী, ডঃ আলী আশরাফ, ডঃ নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড কবির চিকিৎসার জন্য গঠন করা হয়। কবির যে সামান্য চিকিৎসা তা কবি ভবনেই হত। যে 'বেডসোর' নিয়ে কবি এসেছিলেন তা ভাল হয়েছিল কবি ভবনেই চিকিৎসার ফলে। মাঝে মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তন হওয়ায় সর্দি হত এবং মাঝে মধ্যে পেটের অসুখও হত। এ ছাড়া ১৯৭৩ সালের ৮ই জুলাই এবং ১৫ই জুলাই ছাড়া অক্সিজেনের ব্যবহার কবি ভবনে হয়নি। কবির জন্য একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার সবসময় তাঁর পাশেই থাকত। ঐ দুবারই দুপুরের দিকে সাময়িক দরকার পড়েছিল। কোন খারাপ কিছু কখনোই ঘটেনি। এর কারণ বাংলাদেশে আসার পর কবির পরিচর্যার ব্যবস্থা ছিল অধিকতর সুন্দর। ব্রাদার্স-নার্সদের প্রচেষ্টা এবং কবিভবনের সকলের কবির প্রতি সুনজরই ছিল এর কারণ, যার জন্য কবি দিন দিন সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যার ফলে আমরা কবিকে সহজভাবে চলাফেরা করতে দেখেছি।

১৯৭৪ সালে কবির ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জনাব মাহমুদুল্লাহ্‌র আমন্ত্রণে কবি বঙ্গভবনে গেলে সেখানের লনে কবিকে একাকী পায়চারী করতে দেখা গেছে। প্রতিটি পত্রিকায় এই ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। দিনটি ছিল বুধবার ২৯শে মে, ১৯৭৪। তাকে দেখা গেছে কবিভবনের লনে পায়চারী করতে, লন থেকে কবিভবনের সম্মুখের ২৮নং রোডে পায়চারী করতে। এমতাবস্থায় কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর মুসলিম হওয়া এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য কবি ফিরে যাবেন কোলকাতায়, একরকম কথা উঠেছিল। কবিকে কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে দেওয়ার বিবেচনা করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। যাতে মাছিটি পর্যন্ত কবির কাছে যেতে না পারে, এমন ব্যবস্থার কথাও হয়। এরপর ২২শে জুলাই '৭৫, ১২ রজব ১৩৯৫, ৫ই শ্রাবণ ১৩৮২ মঙ্গলবার কবিকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কবি যে কবিভবনেই থাকবেন

www.pathagar.com

সেটাই আশা করেছিলাম। কারণ, এর আগে ১২ই মে কাজী নজরুলের নামে অস্থায়ী এ্যালটমেণ্ট লেটার পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। পত্রটি সরকারের গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হতে এসেছিল। যাহোক, ২২ জুলাই এ সমস্ত ধারণার অবসান ঘটে। কবিকে পিজি হাসপাতাল থেকে পাঠানো একটি এ্যাম্বুলেন্সে নেয়া হয়। একটা ছোট্ট কাগজে ইংরেজীতে লেখা ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পিজি হাসপাতালের ১১৭নং কেবিনে ভর্তি করা হচ্ছে—কয়েকদিন যাবত কবি অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী, তাই তার চিকিৎসার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্চর্য হয়েছিলাম কাগজটি পড়ে। পত্রটির বাহককে বলেছিলাম—কবিতো সুস্থ আছেন। আর স্ট্রেচার পেতেছেন কেন? কবি গাড়ী পর্যন্ত হেঁটেই যাবেন। এ কথায় যারা নিতে এসেছিলেন তারা অবাক হয়েছিলেন—'তাই নাকি? কবি কদিন যাবত অসুখে ভুগছেন আমাদের তো তাই বলা হয়েছে। বল্লাম, এইমাত্র কবি দৈনিকের নিয়মানুযায়ী লনে পায়চারী ক'রে দোতলায় উঠে তাঁর কক্ষে বিশ্রাম করছেন। নাশতা তৈরী হলেই নাশতা করবেন এবং গান শুনবেন। যা হোক তাড়াহুড়ো করে কবির যাবতীয় কাপড়-লুঙ্গী-জামা ঐ সময়ের মধ্যে যতটুকু পারলাম সাথে করে কবিকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সে উঠলাম। কবিকে বিশ্রাম থেকে তুলে পোশাক পরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে আনার সময় কিছুতেই কবি নামবেন না—বারে বারে ফিরে যাচ্ছিলেন। রেলিং আঁকড়িয়ে ধরছিলেন। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে তাঁর প্রিয় ভবনটি থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এ-ও বুঝেছিলাম যে এ ভবনে তিনি আর ফিরবেন না। কবির মৃত্যু তাই প্রমাণ করেছে কবি সে সময় নেমে আসতে চাননি কেন—রেগে ধমকে উঠছিলেন কেন। এই ভবনে কবি টিভি দেখার অভ্যেস করেছিলেন। অভ্যেস করেছিলেন লনে ঘুরে বেড়ানোর, ভক্তদের সাথে সময় কাটানোর ও গান শুনতে। সবচাইতে ভালোবেসেছিলেন কবি ভবনটিকে। কেমন ভালোবেসেছিলেন আমার দুটো উদাহরণেই জানা যাবে—প্রথমটি ঘটে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ। এ সময়ে কবি ভবনের পরিস্থিতি ছিল কবি আর থাকবেন না—এই আলোচনা। এমনি পরিস্থিতিতে কবিকে আমাদের রামপুরাস্থ বাসভবনে নিয়ে যাই, একটি নীলরঙ ভাড়া করা গাড়ীতে কবিকে নিয়ে গেলাম রামপুরার শেলী কুটিরে। গাড়ীতে চড়ে কবি প্রতিবারের মত খুশী হন নাই—বুঝা গেল। গাড়ী থেকে নেমে সামান্য হেঁটে কবি বাড়ীতে পৌঁছান। কিন্তু বাড়িতে চেয়ারে বসেই কবি কেঁদে উঠলেন—আমার মা নাশতা খাওয়ালেন কিন্তু কবির ডুকরে ওঠা কান্না আমার হারমনিয়মে গান শুরু করাতে থামল। কিন্তু কান্না কান্না ভাবটা গেল না। অবশেষে ফিরে আসার পথে গাড়ী ধানমণ্ডির ২৮নং

www.pathagar.com

রোডে পৌঁছাতে কবির চেহারায় হাসির ঝলক দেখা গেল। পথের এপাশ ওপাশ তাকিয়ে তিনি যেন চিনে ফেলেছিলেন জায়গাটি—গাড়ী কবিভবনের ভেতর পৌঁছালে হাসিতে কবির মুখ ভরে উঠেছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ২২শে জুলাই '৭৫ সালে। হাসপাতালে যাওয়ার ক্ষণে কবি সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নীচের তলায় নামতেই চাইছিলেন না। উল্লেখ্য, কবি কিছুই বুঝতেন না এটা ঠিক নয়। তিনি অনেক কিছুই বুঝতেন—আমার এ বইয়ের বিভিন্ন অংশে তারই প্রমাণ রয়েছে। সম্পূর্ণ বইটা পড়লেই তা জানা যাবে। ২৯শে ডিসেম্বর '৭৪ এবং ২২ জুলাই '৭৫-এর ভেতর আরো অনুষ্ঠানে কবি উপস্থিত ছিলেন। এর আগেও যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশে, কিন্তু কখনো কবিকে এমন করতে দেখা যায়নি। অসুস্থতার যে কারণ পত্রিকায় দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কবি ভবনটি একদিন পরই একজন পুলিশ কর্মচারীর (সিটি এস পি) নামে দেয়া হয়। শোনা গেল এটাও যে ১৯শে জুলাই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আ. কা. মো. যাকারিয়া এবং মন্ত্রণালয়ের মীর আনোয়ার আলীসহ স্বাস্থ্য বিভাগের দু'একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কবিকে দেখতে এসেছিলেন বেলা তিনটের দিকে। আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খাওয়ার জন্য রামপুরায় চলে আসতাম। সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। বৃষ্টি হচ্ছিল—বৃষ্টি বাদলেও আমি ভিজেই আসা-যাওয়া করতাম। বৃষ্টি ঐ ১৯শে জুলাই নয় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ১৪ই জুলাই থেকে এবং শেষ হয়েছিল ২১শে জুলাই। ২২শে জুলাই প্রথম সূর্যের মুখ ঢাকাবাসীরা সাতদিন পর দেখেছিল। আর বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১৬ ইঞ্চির উপর। বৃষ্টি বেশী হলে কবি প্রস্রাব বেশী করতেন—এমনকি মেঘলা বা কুয়াশাঢাকা আবহাওয়াতেও। ঐ অনবরত বৃষ্টির সাত দিন কবির প্রস্রাবের ভিজে কাপড় নিয়ে যে কি ধকল পোহাতে হয়েছিল তা বোঝানো মুশকিল হবে। ঐ কাপড় শুকোবার জন্য 'ফ্যান' এবং গ্যাস চুলোর সাহায্য নিতে হয়েছিল প্রতি মুহূর্তে। ঐ সাত দিনের সেঁতসেঁতে আবহাওয়া কবিভবনের ভেতরের অবস্থাকে আরো শোচনীয় করে তুলেছিল। প্রস্রাবের ভিজে কাপড় অনবরত শুকোতে ফ্যানের বাতাস সারা বাড়িটাকে একটা ভ্যাপসা গন্ধে ভরে তুলেছিল। ১৪ তারিখ থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার ষষ্ঠ দিবসে ১৯শে জুলাই সরকারী অতিথিরা কবিকে ঐ গন্ধময় বাড়িতে দেখতে পেয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় প্রতিটা রুমে কবির প্রস্রাবের কাপড়। এরপর আমি অনুপস্থিত। সুতরাং much neglected এবং running with temperature লিখে একটা রিপোর্ট তৈরী করা হল। ঐ সময় আমি উপস্থিত থাকলেও এদের বোঝাতে পারতাম না। ফিরে এসে শুনলাম সমস্ত। খুশী হননি তারা। কিন্তু তাদের খুশী করার জন্য আমি তো সূর্য ওঠাতে পারতাম না! অবশ্য এ অবস্থায় তারা কি করতেন?

www.pathagar.com

সে যাক্, যারা কবিকে দেখে এই রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন তাদের কাউকে এক মুহূর্তের জন্য কবির পাশে দেখা যায়নি। কবির অসুস্থতা কোন্ জাতীয় সে সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান ছিল কম। ১৯৪২ সালের পর কবির যে অবস্থা সেটাই ছিল normal এবং তা হাসপাতালের চিকিৎসায় ভাল হবার কথা নয়—তাঁর চিকিৎসা ধানমণ্ডির কবি ভবনের পরিবেশেই ছিল যথেষ্ট।

বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কবিকে যে এক হাজার টাকা সাহিত্যিক ভাতা হিসেবে দেয়া হত ১৯৭৪-এর ডিসেম্বর থেকে সেই টাকা তুলতে প্রতি মাসেই সচিবালয় যেতাম। টাকা তুলে আনার সময় প্রতিবারই আ. কা. মো. যাকারিয়া সাহেবের সাথে দেখা করতাম। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্যদেরসহ কবিকে দেখে আসতে অনুরোধ জানাতাম—তিনি প্রতিবারই আসবেন বলে কথা দিতেন—জুলাই মাসের ১৩ তেও টাকা তুলে আসার সময় বলেছিলাম দেখে যেতে।

২২শে জুলাই কবিকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ২৩শে জুলাই সকাল আটটায় কবি ভবনকে সীল করা হল। এবং এই সীল করা কাজটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। যার ফলে কবির কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ কৃশা এবং আমি-সহ অন্যান্য আরো যারা কবির কাজে নিয়োজিত ছিল তাদেরও কাপড়-জামা আটকা পড়ে যায়। এতে কবির স্ত্রী প্রমীলা নজরুলের একটি ছবি আটকা পড়ে, যে ছবিটি দেখে কবি আনন্দ পেতেন—সে ছবিটি কবি আর মৃত্যু পর্যন্ত দেখে যেতে পাননি—সীল করার ফলে আটককৃত জামা-কাপড় উদ্ধার করতে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পত্র নিতে মন্ত্রণালয়ে গেলে এবং জনাব যাকারিয়া সাহেবকে সমস্ত বললে তিনি আফসোস্ করেছিলেন। ২৫ জুলাই অনুমতিপত্র নিয়ে জামা-কাপড় আনতে গেলে জানতে পারলাম গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কবি ভবনটি এ্যালট করেছেন সিটি এস পি জনাব মাহবুব উদ্দীনের নামে যিনি সে সময় প্রোমো-শন নিয়ে ডি. এম. হয়েছিলেন। বাংলাদেশকে তখন ৬০টি গভর্নরের শাসনে নেওয়ায় তাঁর প্রোমোশন হয়েছিল। দুষ্ট লোকেরা বলে উক্ত অফিসারটি অচিরেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবানের আত্মীয় হতে যাচ্ছিলেন। উক্ত সিটি এস পি কবি ভবনটি পরিদর্শন করে ভবনটিকে ডিসটেম্পার করার জন্য বলেন এবং কর্তৃপক্ষ তা করেনও। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার খবরে তাঁর এ্যালটমেণ্টও নিহত হয়। তার মালপত্র গ্যারেজ পর্যন্ত উঠেই ফিরে চলে যায়। পরে এই কবিভবনে ঢাকার সে সময়ের কমিশনার জনাব খানে আলম খান কয়েক মাস বাস করেছিলেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিই কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেন নি যে, কবি যে ভবনে থেকেছেন সেটা কবি-ভবন হিসেবেই থাক্। লক্ষ্য করা যায়,

www.pathagar.com

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট এবং গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কবিভবনের কবির নাম কেটে অন্য জনের নামে এ্যালট করা ঘটনাটিকে অতি দুঃখজনক বলা ছাড়া আর কি বলা সম্ভব। তাই রিপোর্ট তৈরীর আগে যাকে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার থেকে সে দায়িত্বের একটা রিপোর্ট নেওয়া প্রয়োজন এবং এটাই নিয়ম। কবিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর গণ্যমান্য অনেকের কাছেই আমি গিয়েছিলাম কিন্তু কবিকে কবিভবনে ফিরিয়ে নেবার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। এর মধ্যে নজরুল একাডেমীর প্রধান জনাব তালিম হোসেন সাহেবও ছিলেন। তিনি চেষ্টা করলেন অন্যভাবে—কবিভবনের দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। তিনি একটি কার্যক্রমের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নিকট। যার মধ্যে নজরুল একাডেমীকে বিস্তৃত করে সেখানে কবির থাকার কথা উল্লেখ ছিল। এতে ঐ একাডেমীও বিস্তৃত হবে সেই সাথে নজরুলের থাকার ব্যবস্থাও হবে। বেশ মোটা টাকার পরিকল্পনা এটা ছিল। এরচেয়ে কবিভবনের প্রতিই তার দৃষ্টি থাকা উচিৎ ছিল, কারণ, বাংলাদেশে কবির ওটাই বাসস্থান গণ্য করা হয়েছিল।

এই কবিভবন নিয়ে পরে ফিরোজা বেগমও উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল 'কলগীতি' নামকরণ করে ওখানে নজরুলের গান শিক্ষা দেয়া হবে এবং ঐ প্রেক্ষিতে তাঁর থাকারও ব্যবস্থা থাকবে। অবশেষে তিনি তার গুলশানের বাসা এবং 'কলগীতি' নাম দিয়ে কবিভবনে থাকতে চেয়েছিলেন। 'কলগীতি' নামটি কমলদাশগুপ্ত ব্যবহার করতেন এবং পরে ফিরোজা বেগমও করেছেন। কবিভবনের পরিবর্তে ঐ নামটি ব্যবহৃত হওয়ায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, কণ্ঠশিল্পী ফিরোজা বেগম শেষ পর্যন্ত কবিভবনে যেতে সমর্থ হন এবং দীর্ঘদিন সেখানে থাকেন। ভবনটির নজরুল ইনস্টিটিউট নামকরণ করার একটা সুন্দর প্ল্যান ছিল—যে প্ল্যানটা বেশ আগে 'কবি-ভবন'-এর ভবিষ্যৎ কর্মধারা হিসেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আমরা পেশ করেছিলাম। '৭৬-এর মৃত্যু দিবসে কবির কিছু ছবিসহ একটা চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কবিকে একবার হাসপাতালে দেখতে গেলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হলে ভদ্রলোক হাসপাতালে কবির এ হেন অবস্থায় খুশী হতে পারেন নি। তিনি কবিভবনেও কবিকে দেখতে যেতেন। উল্লেখ্য, হাসপাতালে ভর্তির এক মাসের মধ্যে কবির পায়ে পানি এসেছিল, শুধু পায়েই নয় সমস্ত শরীরে পানি আসার ফলে কবি মুটিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু বসে থাকা, নিরানন্দ বোবা পরিবেশ, সঙ্গীত বিহীন, চলাচলহীন হাসপাতাল পরিবেশ এর জন্য দায়ী বলতে হয়। কবির চিকিৎসা গানহীন, কথাহীন, বোধহীন, আনন্দহীন

www.pathagar.com

বন্দী জীবনের মত পরিবেশে নয়। কবি 'চিকিৎসা' বলে কথাটার উর্ধ্বে ছিলেন। শুধু গান—আর আনন্দের পরিবেশ ছিল কবির একমাত্র চিকিৎসা। ৪২ সালের ১০ই জুলাইর পর থেকে হাসপাতালে ভর্তির দিনটি পর্যন্ত কবি যেভাবে অন্তত বাংলাদেশে দিন কাটাতেন, সেটাই ছিল কবির 'নরমাল' বা স্বাভাবিক অবস্থা। ১৯৪২ সালে কবি অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথে সুচিকিৎসা হলে কবি সুস্থ হতেন বলে আমাদের ধারণা।—অনাদরে, অবহেলায় সেটা হয়নি যখন, তখন ধীরে ধীরে কবির অবস্থা একটা স্থিতিতে এসে দাঁড়াল। ঐ অবস্থায় কবির ফ্লু হতো, পেট খারাপ করত, চোখে ঠাণ্ডা লাগত সাধারণ মানুষের মত—তাই কবির চিকিৎসা শুধু ওরকম অসুখ করলেই প্রয়োজন হত নয়তো ওটাই কবির স্বাভাবিক অবস্থা।

এবার ১লা জুন ১৯৭৫ থেকে ঢাকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডঃ বায়জিদ খান পন্নী (বি. কে. পন্নী)-র নেতৃত্বে তৎকালীন প্রেসিডেণ্টের অনুমতিক্রমে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। ডঃ পন্নীর সাথে সুফী জুলফিকার হায়দার সাহেবও এসেছিলেন। চিকিৎসার জন্য কবির স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যাদি দিতে তিনিও আমায় সাহায্য করেছিলেন। ৪ঠা জুন শুরু হয় চিকিৎসা এবং ঐ দিনই হোমিওপ্যাথ বোর্ডকৃত নির্ধারিত প্রথম ঔষধ কবিকে সেবন করান এবং সেবন করান ডঃ পন্নী সাহেব নিজে। আমি এখানে ঐ ৪ঠা জুন থেকে তাঁর রিপোর্টের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিলাম—

4th June 75. Pulse 72 pm. Graph medicine given. 5 pils dry on tongue at 12-48 Pm.

6th June 75. On 5th June from 3 to 7 Pm. was very much jolly laughed & smiled so much.

11th June 75. Patient now having two stools a day since 6th instead of one. Quantity same as before each stool. Mr. Shafi informs that patient's mentality is better in the sense that he smiles much more than before. Anger and irritability noticeably less. Pheghu did never use to come out of his mouths before, now these pheghu coming out. On 6th I been wiped off, ordered seduction of sedative pill. Now ½ pill twice a day is enough to make him sleep instead of thrice

www.pathagar.com

daily. Instructed to try cut further. Before, the fingers used to tremble even during sleep, though during sleep this was less than when he was awake. Today when he went to sleep during my presence there was not the slightish trembling in tremor in either hands. On previous occassion I found feet quite cold as noted before, today I found warmer. When the attendants used to undress him for change of clothes he used to protect a fit-fut sincc last 3/4 days he is showing signs of modesty and shame & objecting & throwing off their hands. Restlessness in moving away after sometime of sitting is same. BP 135/80 & Pulse 76 pm.

16th June 75. General condition same. Sedative still less being given without loss of sleep. Now ½ tab. twice daily being given. Before, less than that dose resulted in lack of sleep. The improvement in irritability & smiles continues, the smiles a bit more. The sense of modesty, shame when changing clothes is more. Previously when changing lungi was thrown on to floor by him but now he used to drag it with his foot. No he lifts his foot to avoid it. Still having the two stools a day. Phelgis still coming out. Feet seems to be slightly metors. But the warmth of both hands and feet are more. It seems to me after some observations that the tremor of left hand is lesser than on 11th even when we irritated him to include garlic in food. BP 160/80.

28th June 75. Poet seems to have improved still more. Needing less sedative now—once ½ tab, only. Sleeping on. Smiles continues. Mental state yet better than 16th. Smiles more than 16th. Shame and modesty increased

www.pathagar.com

greatly, now strongly objects any incomings when he changes clothes. Now stools 2 to 3 times a day. Hawking less. Now he does not like to sit or remains in bed for long. Attendant think he is stronger, needs less help from them in movements. We found no tremor of left hand. BP. 125/85.

2nd July 75. It seems that the action of graph/1 exhausted, as the limbs are again cold and I found the tremor of left fingers back. BP at 9-15 Pm. 138/90. Previously when his lungi became loose he could hardly fix and tighten it. Since yesterday he is fixing it much better way.

3rd July 75. BP at 1-10 P. M. 138/80. Poet has started moving from room to room.

6th July 75. Poet much calmer now. I have never seen him so calm foı so long. He is now sitting quitely for 10 to 15 minutes without any movement—looking from facc to face when talking and to who is talking. Mr. Shafi says, he used to either take other peoples help to shave the poet or at least use force. Now he does not trouble him to shave. He used to throw it down on his left but now he gave him two books one after another, after looking at him he put there back on the table. He used to hate pens now we handed him a pen he kept it for long and finally handed it back. Previously whenever out of two pillows were given to him, one he used to throw out. Now he keeps both and sleep on it. Irritability still less. Poet was afraid of darkness, darkıoom, now he goes into darkroom. Now in his unilligible utterance are being heard as it tries to express something. Since

www.pathagar.com

1/2 days poet is resisting stripping him so resolutely that force is being used more, because he is so stronger. BP 144/85.

13th July 75. Saw poet this afternoon. Found him extremely excited, agitated, irritated and frightened. Mr. Shafi informed that since our last visit a week ago poet was alright, infact he used to get up from bed and move about all by himself. And this morning he particularly calm and composed. But since noon he has become terribly angry and irritable. We took temperature and found it 99.6 (armpit) BP 150/80. It apparently seems to be an attack of flue type cold which is rempant in city now. But afterwards order to take temperature in every three hours and inform me tomorrow morning.

14th July 75. Attendant (Mr. Shafi) informed in morning that during the night he slept well and by morning the temperature became normal (96^{0}) also became mentally OK and calm. No complications.

16th July 75. Found poet normal. The hands and feet are quite cold may be to some extend due to weather also. BP 135/80.

30th July 75. A few days after one day people from health department of Government went to see the poet, they found him lying in wet bed, running temperature and in bad condition. So they talked with Dr. A. Rahim and suggested removal of the poet to PG Hospital as the poet was much neglected. Dr. Rahim agreed to the poet was transferred to PG. We want to see him in the afternoon of 30th July '75 as found extremities very cold. Pressure was found low—115/70. Physically weaker.

www.pathagar.com

Irritability to touch lesser than before. Saw the chart of PG. Found he was being given sedatives in heavy doses, plus largetic, plus a sulpha drug—all these things may have resulted in low pressure. I think the improvment by Asst. has gone as far as it can.

1st August 75. Poet better. Extremities are warmer than before. So the BP 140/80 to-day. Smiles are more than on 30th.

3rd August 75. Administerd sulph M/1 5 pills dry on tongue.

5th August 75. Report of face swallen on waking in morning subsided by after breakfast. Found him more irritated dislike of touch. Poet sleeping well without largectic.

9th August 75. BP 160/80. Yet extremities cold may be due to sitting under fan, without any cover in genji. Asstt. Matron reported a vesicle came up and burst on the rt. gluttical muscle. Exam it, the nurses had applied Gentian violet all over the place. Can it be a centrifugal action of syph (medicine) trying to throw syphilitic ulcers out ? Poets mental calmers worsened the tremors more. Apparently poet's general improvement which appeard seems lost to a considerable extend. Asstt. Matron reports lack of sleep.

10th August 75. Saw poet in evening. Found him a bit less irritable than yesterday noticed that he is occassionlly shouting out. After that had meeting with prof. N. Islam, Dr. N. Chowdhury the PG Psychiatrist and ex-head of Pabna Mental Hospital discussed about the patient.

১লা জুন থেকে ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত ডাঃ পন্নী কবিকে চিকিৎসা করেছেন এবং সে চিকিৎসার রিপোর্ট উল্লেখিত হল। ১লা জুন থেকে ১৬ই জুলাই এবং ৩০শে জুলাই থেকে ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত দুটো ভাগের প্রথমটি কবিভবনের এবং দ্বিতীয়টি হাসপাতালের চিকিৎসার রিপোর্ট। এর মধ্যে ৩০শে জুলাইর রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা আমি পূর্বেই করেছি। ডাঃ পন্নীর রিপোর্ট অনুযায়ী কবির 'ফ্লু' হয়েছিল ১৩ই জুলাই এবং ১৪ই জুলাই সকালে ভালোও হয়ে গিয়েছিল এবং ১৬ই জুলাই তিনি কবিকে নরমাল দেখে এসেছিলেন। তবে ১৯শে জুলাই

www.pathagar.com

কবি running with termpeiature কি করে দেখলেন। এবং অসুখ থাকা অবস্থায় ২২শে জুলাই হাসপাতালের পাঠানো এ্যাম্বুলেন্সে কি করে উঠলেন?

যাক, ১লা জুনের আগেও কবি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। সপ্তাহখানেক পূর্বে ২৬শে মে কবির ৭৬তম জন্মজয়ন্তীতে বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্পীবৃন্দসহ আগত সবাই দেখেছেন কবির স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে খুশী হয়েছিলেন। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনের সংস্কৃতি সচিব শ্রী এ. কে. দত্ত গুপ্ত মহাশয় ঐ দিন কবিভবনে দুপুরের দিকে কবির পাশে কবির দুপুরের বিশ্রামাবস্থায় আমার সাথে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়েছিলেন। কবি সম্পর্কিত অনেক খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। কবির স্বাস্থ্যের প্রতি তিনিও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিকে মাসে যে তিনশ' টাকা দিয়ে আসছিলেন, কবি পুত্রবধূর চলে যাবার পর ডিসেম্বর '৭৪ থেকে তা তোলা হয়নি এবং তার প্রয়োজন হলে তুলে আনবার কথাও উল্লেখ করলেন সে সময়। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার (রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ) এবং কবির ছাত্রী শ্রীমতী রেণু (বসু) ভৌমিকও কবির স্বাস্থ্যের উন্নতিতে খুশী হয়েছিলেন। খুশী হয়েছিলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমীর সচিব জনাব কাজী মজহার হোসেন।

১৯৭৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের পর কবিকে আমার দায়িত্বে যখন পেলাম তখন প্রথম থেকেই একটা 'রুটিন' করে দিয়েছিলাম যে, কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন সকালে সাড়ে ছয়টা নাগাদ হরলিক্স, সাড়ে আটটা নাগাদ নাশতা সে সঙ্গে গান শোনান, এর আগে গোসল করিয়ে দেবার সময় নির্ধারিত ছিল। সকাল ন'টা থেকে এগারটা পর্যন্ত ভক্তদের সঙ্গে। এগারটা থেকে বারটা পর্যন্ত বিশ্রাম। এবং বারটা থেকে সাড়ে বারটা নাগাদ দুপুরের খাওয়া। এরপর বিকেল চারটা পর্যন্ত বিশ্রাম। বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ নাশতা এবং এরপর ভক্তদের সঙ্গে সন্ধ্যে পর্যন্ত এবং সে সঙ্গে গান পরিবেশন। সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত বিশ্রাম। এরপর রাত নটা পর্যন্ত টিভি দেখা। এরপর রাতের খাওয়া এবং সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে রাতের ঘুমের জন্য বিছানা গ্রহণ। অবশ্য সকালে কিম্বা বিকেলে পায়চারী করার সময়ও নির্ধারিত ছিল। প্রতি শুক্রবার শেভ, এবং এক শুক্রবার অন্তর নখ কেটে দেয়া—সমস্তই নিয়মের মধ্যে এনেছিলাম। কবিকে আমি কখনোই 'একা রয়েছেন' এটা ভাবতে দিইনি। যতক্ষণ পেরেছিলাম সঙ্গে থেকেছি। আনন্দ-ইয়ার্কি করতাম—দাদু দাদু বলে কথা বলতাম। গান

www.pathagar.com

করার সময় চট করে গান বন্ধ করে দিলে হাতের ইশারা না করা পর্যন্ত গাইতাম না। হাতের ইশারা করলে এমনি মুহূর্তে। তবলচী পরিতোষ সাহা তবলা বাজানো বন্ধ করলে হাতের ইশারা করতেন বাজাতে। বই-কাগজ দিয়ে টেনে নিতাম—তিনি চেয়ে নিতেন। টিভি রোজ রোজ দেখাবার অভ্যেস করানো হলে পর মাঝে মধ্যে নিজে থেকে চলে আসতেন টিভি দেখতে। খুব মনোযোগ সহকারে দেখতেন। দাদুর টেলিভিশন দেখার সময় ইচ্ছা করে গণ্ডগোল করলে ধমক দিতেন—মিনিটখানেক তাকিয়েও থাকতেন গণ্ডগোলকারীদের দিকে, যেন কতবড় ক্ষতি করা হল। কবি পরিবারের মত কবিকে একাধিকবার দৈনিক গোসল করাবার পরিবর্তে একবারই গোসল করাবার নিয়ম করেছিলাম। কিন্তু এতে কোন অসুবিধে হয়নি কখনো। ফাংশনে গিয়ে কখনো কবি পুরো অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকতেন না কিন্তু পরবর্তী সময়ে কবি বেশ কটা অনুষ্ঠানে পুরোপুরি ছিলেন কিন্তু কবিকে একটুও ক্লান্ত মনে হয়নি।

আমি কবিকে পায়চারি করার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম করায় এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় ওঠার সময় শেষ পাঁচটা সিঁড়ি কবিকে ছেড়ে দিলে কবি একাই উঠে যেতে পারতেন। কবির শক্তি যথেষ্ট ফিরে এসেছিল। দেখিয়ে দেবার ফলে এবং অভ্যেস করান হলে কবি নিজে থেকে গ্লাস তুলে পানি খেতে পারতেন, চামচে করে কিছু খেতেও পারতেন এবং এ সমস্ত অভ্যাস ডিসেম্বর থেকে করা-বার ফলে কবির ১লা জুনের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার সংযোজন হলে কবির স্বাস্থ্যের অধিকতর উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, এখন আমি সে সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করছি। যেমন কবি আগে লুঙ্গি পরাবার কিম্বা খোলার সময় তাঁর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যেত না। একদম পাওয়া যেতনা বললে ভুল হবে তবে লুঙ্গী খোলার সময় পা তুলে খুলে নিতে সাহায্য করতেন। লুঙ্গী পরিয়ে গিরা বা বেঁধে না দিলে তিনি লুঙ্গি ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বেঁধে দিতে চোখ দিয়ে ইশারা করতেন। গেঞ্জী কিম্বা সার্ট মাথায় গলিয়ে দিলে এবং হাতে গুজে দিলে টেনে নামিয়ে নিতে পারতেন শরীরে। ১৬ই জুন '৭৫ রাত থেকে খাওয়ার সঙ্গে একটি করে রসুনের কাঁচা টুকরো দেয়া হলে কবির স্বাস্থ্যের আরো উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর ফলে কবি বিছানা থেকে একাই উঠে আসতে পারতেন। বিছানা থেকে একাই উঠে আসতে পারতেন ইতিপূর্বেও কিন্তু কাৎ হয়ে শুয়ে থাকলে। চিৎ অবস্থায় শুয়ে থাকলেও তিনি উঠে আসতে পারতেন। দরজার হুক খুলবার চেষ্টা করতেন। এবং ভেতরের থেকে বাইরে আসার দরজার হুক খুলতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাইরে বারান্দার থেকে ভেতরে তাঁর কক্ষে

www.pathagar.com

প্রবেশের দরজার হুক প্রায়ই খুলে ফেলতে পারতেন এবং এমন অবস্থায় আবার আমাদের পানে তাকাতেন যেন তিনি জয় করেছেন। তাঁর বিছানায় দুটো বালিশই চিরকাল থাকত। তবে তিনি জাগ্রত অবস্থায় তাঁর বিছানাতে দুটো বালিশ দেখলে, এই যেমন বিছানায় বালিশ গোছানো রয়েছে, তিনি বাইরে থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে ফেলে দিতেন একটা। কিন্তু ঘুমোবার সময় দুটো বালিশের উপর মাথা রাখলে তাঁর আপত্তি ছিল না। তবে হাসপাতালে যাবার কিছুদিন পূর্ব থেকে তাঁর এই দুটো বালিশ বিছানায় দেখাতেও আপত্তি দেখা যায়নি। তবে 'কলম' তিনি অপছন্দ করতেন। মনযোগ সহকারে কখনোই তাঁকে কলম ধরতে দেখিনি। যেমন গানের কবিকে হারমনিয়মের রীড ধরিয়ে দিলেও আঙ্গুল রাখতেন না রীডের উপর—সরিয়ে নিতেন আঙ্গুল, নয় হারমনিয়ম ঠেলে সরিয়ে দিতেন। তবে সরিয়ে দিয়েই সে আঙুল দিয়েই নির্দেশ করতেন ইঙ্গিত করে গান করবার জন্য। পিজি হাসপাতালে আসার দিন বিশেক পূর্ব থেকে কবি ঘুমের ঔষধ ছাড়াই ন্যাচারাল ঘুমোতেন। যা ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। এমনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কবি নজরুল। হাসপাতালে নিয়ে আসার দশ-বিশ মিনিট পূর্বেও যিনি ২৮নং সড়কে পায়চারী করে ওপরে উঠে এসে যার শেষ পাঁচটি সিঁড়ি একাকী উঠে এলেন অভ্যাসমত, তাঁকেই কিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হল 'কয়েকদিন যাবৎ জ্বরে শয্যাগত' বলে। ডাঃ পন্নী ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত পিজি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চালিয়েছিলেন কিন্তু পিজি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার মতের মিল না হওয়ায় তিনি তাঁর চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। জনাব পন্নী সাহেবের মত ছিল কবির পক্ষে ন্যাচারাল ঘুম আন-ন্যাচারাল (ঘুমের ঔষধ দিয়ে) ঘুম থেকে অনেক ভাল—কিন্তু এই মত পিজি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য হয়নি।

পিজি হাসপাতালে কবি ভর্তি হয়েছিলেন ২২শে জুলাই '৭৫, ৫ই শ্রাবণ ১৩৮২ এবং ১২ই রজব ১৩৯৫ সালে মঙ্গলবার—যে মঙ্গলবার কবি জন্মেছিলেন। যে মঙ্গলবার কবির শেষ জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে এবং সেই মঙ্গলবার কবি মৃত্যুর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং কবির জীবনে দেখা যায় 'মঙ্গলবার' একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কবি জসীম উদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এক পর্যায়ে। দু'চার-দশ দিন পর পর প্রায়ই কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে যেতাম কিন্তু কবির কোন উন্নতি লক্ষ্য করিনি। হাসপাতালে কবির ব্রনকাইটিস জাতীয় অসুখও কয়েকবার হয়েছিল। কবির মৃত্যুর মাস দেড়েক পূর্বে একবার কবিকে

www.pathagar.com

দেখতে গিয়ে কবির বাম হাতখানা ফুলে রয়েছে দেখলে কর্তব্যরত ব্রাদারকে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম 'ম্যাসেজ' এর জন্য টানাটানি করার ফলেই আঘাত লেগে ফুলে গেছে। কি বলব ! কবি কখনোই তাঁর হাত টানাটানি করতে দিতেন না—যার ফলে টানাটানিতে একটু জোর দেয়ার ফলে মচকে সম্পূর্ণ হাতটাই ফুলেছিল। এবং ঐ ফোলা হাতটিতে স্পর্শ করায় কবির শরীর কেঁপে উঠেছিল। এত ব্যথাও ছিল সে হাতে। এবং সেই হাত মৃত্যুর দুদিন পূর্বে শুক্রবারেও দেখেছিলাম ফোলা ছিল। হাসপাতালের অপর একটি ঘটনা বলছি—কবির মৃত্যুর দিন বিশেক পূর্বে কবিকে দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম কয়েকজন ব্রাদার মিলে কবিকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে চিকিৎসা করছে। এবং চিকিৎসার পর কর্তব্যরত ব্রাদারকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারলাম কবিকে পূর্বের ডিউটি-রতরা ঠিকভাবে পরিষ্কার করেননি বলে ময়লা জমতে জমতে কবির দু'পাশের 'কুচকি'তে ঘা হয়েছিল।

ছোট্ট একটি ঘটনা না বললেই নয়—কবিভবন সীল করার ঘটনাকে আমি বলব একটি দুঃখজনক ঘটনা। গণপূর্ত বিভাগের ঐ এলাকার প্রকৌশলী (সি এণ্ড বি) জনাব মজিদ চৌধুরীকে যেভাবে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি সীল করতে দেখা গিয়েছিল যে, মনে হল কোন দখলদারদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে বাড়ি পুনরায় দখলের পূর্বেই সীল করে দেয়া হোক। নজরুল যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ি এমনিভাবে সীল করা একটি করুণ উদাহরণ।

কবি নজরুল আমাদের ছেড়ে চলে যান চিরতরে ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩, ২৯শে আগষ্ট ১৯৭৬, ২রা রমজান ১৩৯৬-এর রোববার। ঐ রোববার নিয়ে কবির একটি কবিতা পাওয়া যায়। কবিতাটি লেখা হয়েছিল দেওঘরে ১৯২৮ সালের কোন এক সময়। 'অবসর' নামক এই কবিতার মর্মার্থ যদিও অন্যরকম তথাপিও এই রোববারকে স্মরণ করলে দোলা লাগে মনে। কবিতাটির শুরু এভাবে—

"লক্ষ্মী আমার ! তোমার পথে আজকে অভিসার,
অনেকদিনের পর পেয়েছি মুক্তি রবিবার।"

হ্যাঁ এই "মুক্তি রবিবার" তাঁর চির মুক্তির রবিবার বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৩৫ সালে লিখেছিলেন বিখ্যাত ইসলামী সঙ্গীত—

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে
পবিত্র সে পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে—

www.pathagar.com

গোর-আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই ॥
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওয়াত—
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই ॥
কত দরবেশ ফকিররে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লাহ্‌র নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে (আল্লাহ্‌র) নাম জপতে চাই ॥"

কবির এ গানের আকুতি-অভিলাষ আমরা রাখতে পেরেছি বলে আমরা আজ আনন্দিত। এমন সুন্দর আকুতি-আবেগ আমরা এ গানটাতে পাই যেন আমাদের আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে, তাঁর কথায় কথা রেখে তাঁর সুরে সুরে মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে করে এই গান।

আমাদের প্রিয় কবিকে দাফনের সময় ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়েছিল—বিউগলের করুণ সুর বেজে উঠেছিল—সামরিক বাহিনীর একটি ছোট্ট ইউনিট দেশের পক্ষ থেকে কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছিল। রোববার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হওয়ারসহ পরদিন সোমবারকে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কবির কুলখানি হয় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে এবং চেহলাম হয় নজরুল একাডেমীতে।

উল্লেখ করতে হয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কবির জানাজা হলে কবির লাশ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বয়ে আনেন কাঁধে করে প্রধান সামরিক প্রশাসক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌ প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার কমোডর এ জি মাহমুদ এবং প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম।

কয়েকটি অনুষ্ঠানে নজরুল

কবি নজরুল বাংলাদেশে আসার পর তিনি কবিভবন ছেড়ে বাইরে যে ক'টি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন এখানে তারই বর্ণনা রয়েছে পৃথকভাবে। একত্রিত না করে পৃথকভাবে অনুষ্ঠানগুলোর বর্ণনা দেয়ার কারণও বলছি। কবি নজরুলের পবিত্র পায়ের ছাপ যে অনুষ্ঠানকে সুন্দর করতে সাহায্য করেছে সেগুলোর মূল্য রয়েছে বলেই এই পৃথকভাবে বর্ণনা করার কারণ।

প্রথম অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমীতে অনুষ্টিত বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে কবিকে এ দেশে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রথম দেখা যায়। অনুষ্ঠানটি ছিল ১৯৭৩ সালের ২৫শে

www.pathagar.com

মে কবির ৭৪তম জন্ম জয়ন্তীতে। কবিভবনে নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠান-এর ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আধঘণ্টার জন্য কবি উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলা একাডেমীর নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে। বাংলা একাডেমী থেকে সকাল আটটার এ অনুষ্ঠানের জন্য সময়মত গাড়ী পাঠানো হয়েছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরাসহ অনেকেই সে দিন সেই মূল্যবান অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য, বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে কবিকে এক নজর পাশে পাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। বাংলা একাডেমীর পুরাতন ভবনের সম্মুখে যে বিরাট বটগাছ, তারই নীচে একটি চেয়ারে আসন দেয়া হয়েছিল কবিকে। কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে বেশ ক'বার পায়চারী করে-ছিলেন। মাঝে মধ্যে হাত পাখার ব্যবহার করা হয়েছিল গরমের জন্য। কোলকাতা থেকে আগত কবি নজরুলের একজন সহচর বিশিষ্ট নাট্যকার শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ভাষণ দিয়েছিলেন সে অনুষ্ঠানে। কবিভবন থেকে কবির সঙ্গে উমাকাজী, রেণু (বসু) ভৌমিক এবং আমি গিয়েছিলাম। কবির সাথে ফেরার পথে উমা কাজী এবং আমি চলে এসেছিলাম, শ্রীমতী ভৌমিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য সেখান থেকে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান

এটিও বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আট দিবসব্যাপী হয়েছিল। ষষ্ঠ দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন কবি স্বয়ং। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে এ অনুষ্ঠান হয়েছিল। বর্তমান বাংলা একাডেমীর নতুন ভবনের সম্মুখে যে মঞ্চ হয়েছিল সে মঞ্চে কবি কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে কবির সাথে খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী, বাবুল কাজী, উমাকাজী, ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় এবং আমি ছিলাম। কবি এ অনুষ্ঠানে পঁচিশ মিনিটের মত ছিলেন।

তৃতীয় অনুষ্ঠান

কবির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান শুধু কবিভবনের বাইরেই নয় ঢাকারও বাইরে হয়েছিল। টাঙ্গাইলের করটিয়া কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকরা কবিকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই সাথে এক সময়ের বাংলাদেশ মুক্তি-যুদ্ধের নায়ক কাদের (বাঘা) সিদ্দিকীও কবিকে টাঙ্গাইলে দাওয়াত করেন। ১৯৭৪ সালের ১১ই মে সকাল সাতটায় একটি ভক্সওয়াগন মাইক্রোবাসে করে আমরা টাঙ্গাইল অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম। খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী, বাবুল কাজী, উমাকাজী এবং আমি ছিলাম কবির সাথে। এ অনুষ্ঠানে যাবার

www.pathagar.com

পথে কয়েকটি স্মৃতি আজো মনে পড়ে। কবি বসেছিলেন ড্রাইভারের ঠিক পেছনে। শোবার বন্দোবস্তও সেই সীটে করা হয়েছিল। কিন্তু একটুও গা এলিয়ে দেননি কবি, বসেই ছিলেন। গাড়ী শহর ছেড়ে একটু দূরে গেলে কবি ড্রাইভারকে পেছন থেকে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে বারে বারে স্পীডে আরো স্পীডে চালাবার জন্য বলছিলেন। গাড়ীর স্পীড বাড়লেই কবি আনন্দে হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করছিলেন এবং স্বভাবসুলভ মাথায় হাত রাখছিলেন, চোখে-মুখে সে হাত বুলাচ্ছিলেন। গাড়ী এত স্পীডে চলছিল যে একটি ঘু-ঘুপাখী গাড়ীর সাথে ধাক্কা লেগে অক্কা পেয়েছিল। ফেরার পথেও ঐ দিনই বিকেলে কবিকে অমনি ড্রাইভারকে খোঁচা দিয়ে স্পীড বাড়াবার দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। প্রথমে টাঙ্গাইলে গিয়ে কাদের সিদ্দিকীর অফিসে কবি এবং আমরা উঠেছিলাম। সেখানেই কবির থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। দিনটি বৃষ্টির দিন থাকা সত্ত্বেও টাঙ্গাইলের বিখ্যাত 'নজরুল সেনারা' কবিকে যেভাবে 'গার্ড অব অনার' প্রদর্শন করেছিলেন তা মনে রাখার মত। স্কুলের সারা পথ বৃষ্টির জন্য কবি গাড়ীতেই বসেছিলেন। তা সত্ত্বেও মাইক্রোবাসের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল। কবিকে এবং কবির গাড়ীতে যেভাবে ফুল ছড়ানো হচ্ছিল তা গুড়ো বৃষ্টিকে পর্যন্ত হার মানিয়েছিল। গাড়ী থেকে অবশ্য বিশ্রামের জন্য নেমেছিলেন। সেখান থেকে 'গার্ড অব অনার'-এর জন্য কবিকে গাড়ীতে করে মাঠের মধ্যে আনা হয় ছাতার আড়াল করে। গাড়ী থেকে সামান্য সময়ের জন্য কবিকে নামান হয়। অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে গাড়ীতে নিয়ে একদম চলে আসা হয় করটিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে। সেখানেও ছাত্ররা কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন 'গার্ড অব অনার' প্রদর্শনের মাধ্যমে। ঢাকা চলে আসার পূর্বে কবি পরিবারের ইচ্ছায় করটিয়ার বিখ্যাত পন্নী সাহেবদের বাড়ীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, করটিয়া এবং টাঙ্গাইলে আসার আগের রাত থেকে কবির ডান চোখ ঠাণ্ডা লাগার ফলে লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কবির কোন অসুবিধে হয়নি।

চতুর্থ অনুষ্ঠান

২১শে মে ১৯৭৪, বাংলা ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১। কবি ঢাকার রামপুরা একরামুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ অনুষ্ঠানে কবির সাথে এসেছিলেন উমাকাজী এবং কবির ছাত্রী শ্রীমতী রেণু (বসু) ভৌমিক। দু'ঘণ্টার মত কবি এ অনুষ্ঠানে ছিলেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এ অনুষ্ঠানের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অনুষ্ঠান

২৪শে মে ১৯৭৪। নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠান। ঢাকাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিএসসি হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজের অধ্যাপক জনাব শরীফুল ইসলাম সাহেব কবিকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। অনুষ্ঠানটি আমার কাছে স্মরণীয় এজন্য যে আমারই অনুরোধে অধ্যাপক ইসলাম সম্মেলনে কবির উপস্থিতিতে নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবির উপস্থিতিতে এরকম প্রস্তাব সত্যি আনন্দপূর্ণ। কিন্তু প্রস্তাবটিকে সহযোগিতা করতে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠানকে কিম্বা সরকারকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। তবে সে সময় না হলেও কবির নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত ব্যাপারে ধীরে ধীরে একটা গুঞ্জন ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কবি এ অনুষ্ঠানে কিছুক্ষণ ছিলেন। কবির সঙ্গে এ অনুষ্ঠানে কোলকাতা থেকে সেবারের কবিভবনের নিজস্ব অতিথি হিসেবে আগত কবির দ্বিতীয় পুত্রবধূ শ্রীমতী কল্যাণী কাজী, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ উমাকাজী এবং আমি ছিলাম।

ষষ্ঠ অনুষ্ঠান

২৭শে মে ১৯৭৪। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আবাসিক হলের ছাত্ররা কবিকে তাদের নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলে কবি সে দাওয়াত রক্ষা করেন। এ অনুষ্ঠানে কাজী সব্যসাচী ইসলাম কবিতা আবৃত্তি করেন। কল্যাণী কাজী, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় এবং রেণু ভৌমিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রাত বেশী হয়ে যাচ্ছিল বলে এবং বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল বলে কাজী সব্যসাচী এবং অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কবির সাথে আমি চলে এসেছিলাম। কবি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অনুষ্ঠান শেষে এসেছিলেন।

সপ্তম অনুষ্ঠান

২৮শে মে ১৯৭৪। নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান। সন্ধ্যের পর এ অনুষ্ঠানে কবি এবং তাঁর পরিবার যোগ দিয়েছিলেন। কবির পরিবার এ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। অন্যান্যের মধ্যে কোলকাতা থেকে আগত কবির প্রিয় ছাত্রী উপমহাদেশের বিখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী শ্রীমতী আঙ্গুরবালা এবং সেই সাথে কোলকাতা থেকে আগত

www.pathagar.com

অপর প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীতবিশারদ শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। যদিও এদের সঙ্গীত পরিবেশনের পূর্বেই কবি চলে এসেছিলেন।

অষ্টম অনুষ্ঠান

২৯শে মে ১৯৭৪। তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জনাব মাহ্‌মুদুল্লাহ্‌ কবির ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবি এবং কবি-পরিবারকে আমন্ত্রণ জানালে বঙ্গভবনে এ অনুষ্ঠান হয়। বিকেলে বঙ্গভবন থেকে গাড়ী পাঠানো হয় এবং সন্ধ্যের বেশ পরে কবি ফিরে আসেন। এ অনুষ্ঠানে কবি বঙ্গভবনের লনে একাকী পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে যে পায়চারী করছিলেন তাঁর একটি ছবি পত্রিকায় প্রকাশ পেলে সে ছবিটি সারাদেশে প্রচুর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

নবম অনুষ্ঠান

১১ই জুন ১৯৭৪। মীরপুর ফাইজার ঔষধ কোম্পানীর উদ্যোগে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে কবিকে আমন্ত্রণ জানালে কবিকে নিয়ে উমাকাজী, খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজীসহ আমি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করি। কবির প্রতি এদের আদর আপ্যায়ন মনে রাখার মত। কবির উপস্থিতির অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় এ অনুষ্ঠানেও কবি পরিবারের সদস্যরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অন্যান্য শিল্পীও এ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক কবি এ অনুষ্ঠানে ছিলেন।

দশম অনুষ্ঠান

১৩ই জুন, ১৯৭৪। গেণ্ডারিয়া সীমান্ত খেলাঘরের উদ্যোগে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কবি উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে কবি প্রায় ঘণ্টাখানেক উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠানের জনৈক উদ্যোক্তার বাড়িতে কবি কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন।

একাদশ অনুষ্ঠান

তারিখটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত ১৭ই জুন ১৯৭৪ হবে, এই অনুষ্ঠানটিও ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জের কয়েকজন কবিভক্ত ছাত্রের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ টাউন হলে হয়। প্রচুর ভিড় পরিলক্ষিত হয় এ অনুষ্ঠানে। প্রায় অনুষ্ঠানের ন্যায় এ অনুষ্ঠানেও দুটো গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয় কবি পরিবারসহ কবির যাতায়াতের জন্য। এই

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানেই কবি পরিবারের সদস্যদের কবির সাথে শেষবারের মত দেখা যায়। এর অবশ্য বেশ কিছুদিন পর উমাকাজী রিজিয়া বেগমে পরিণত হয়ে বিয়ে করে কবিকে ছেড়ে চলে যান। খিলখিল-মিষ্টি-বাপী চলে যায় কোলকাতায় পূজো দেখতে এবং তাদের মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে গেলে তারা আর ফিরে আসেনি। যার ফলে এই নারায়ণগঞ্জের অনুষ্ঠানে শেষবারের মত এদেরকে কবির সাথে দেখা যায়। এ অনুষ্ঠানে কবির ছাত্রী কোলকাতা থেকে আগত শ্রীমতী রেণু ভৌমিকও ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের এ অনুষ্ঠান শেষে কবি এবং আমরা চলে আসি। উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ শহরে পৌঁছে গাড়ী নষ্ট হয়ে গেলে কবি পরিবারের অন্য সদস্যদের গাড়ী অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যেই পৌঁছে যাওয়া গাড়ীকে লোক পাঠিয়ে এনে কবি এবং আমি যে গাড়ীতে ছিলাম তা পাল্টিয়ে ঐ গাড়ীতে চড়ে যেতে হলেও অনুষ্ঠানে পৌঁছাতে কোনরকম অসুবিধে হয়নি। তবে এ ঘটনা মনে থাকবে অনেক দিন।

দ্বাদশ অনুষ্ঠান

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৪। আমার বাবা-মা-ভাইদের উদ্যোগে আমাদের নিজস্ব রামপুরাস্থ শেলী কুটিরে কবিকে দাওয়াত করে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে আটটায় একটি গাড়ী করে আমার দুই সাহায্যকারী খালেক এবং মুজিবকে নিয়ে রামপুরা শেলীকুটিরে পৌঁছাই। যেখানে গাড়ী দাঁড়ায় সেখান থেকে সামান্য কিছুটা পথ কবি হেটেই আমাদের বাড়িতে পৌঁছে ছিলেন। কবি নাশ্‌তা আমাদের বাড়িতেই করেছিলেন। কবি আমাদের বাড়িতে পৌঁছেই ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। অবশেষে হারমনিয়ম ধরে একটা গান শুরু করলে কবির কান্না থামলেও কান্না কান্না ভাব ধানমণ্ডির ২৮নং সড়কে গাড়ী না পৌঁছা পর্যন্ত কমেনি। একটু উল্লেখ করতে হয়, কবি হয়তো বুঝেছিলেন তাঁকে তাঁর প্রিয় ধানমণ্ডির কবিভবন থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ, সে সময় কবিকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার কথা বারংবার আলোচিত হচ্ছিল। তবে কবি-ভবনে ফিরে তাঁর হাসির মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

ত্রয়োদশ অনুষ্ঠান

২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫। ঢাকা ইউনিভার্সিটি আয়োজিত কবিকে সম্মান-সূচক সাহিত্যে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করার 'প্রতীক প্রদান' অনুষ্ঠান এ দিনে অনুষ্ঠান হয় বঙ্গভবনে। অবশ্য কবির সাথে ভূষিত করা উপাধিপ্রাপ্ত অন্যান্য

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে 'প্রতীক প্রদান' ইতিমধ্যেই ১৯৭৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য যারা কবির সাথে ডক্টরেট পেয়েছিলেন তাদের তুলনায় কবির দান জাতির কাছে অনেক বেশী বলে কবির তরফ থেকে আমি কবির জন্য একটা ভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে বঙ্গভবনে এই 'প্রতীক প্রদান' অনুষ্ঠান ভিন্নভাবে করা হয়েছিল। 'প্রতীক প্রদান' করেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জনাব মাহ্‌মুদুল্লাহ্‌। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো গাড়ীতে কবির সাথে আমি এবং আমার সাহায্যকারী হিসেবে মেডিকেল কলেজ থেকে কবিভবনে ডিউটিতে নিয়োজিত ব্রাদার আবদুল জলিল এবং খালেককে নিয়ে যাই। কবিভবন থেকে গাড়ীটি আমাদের নিয়ে রওনা হয়ে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সম্মুখে দাঁড়ায়। এরপর সোজা বঙ্গভবনে চলে আসে। বঙ্গভবনে পৌঁছবার পর কবি গাড়ী থেকে অবতরণ করার পর প্রেসিডেন্টের অফিস রুমের দিকে যাচ্ছিলেন তখন সে সময় প্রেসিডেন্টের গার্ডবাহিনী 'হ্যাটস অফ' বলে কবিকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। কবির পরনে ছিল ডক্টরেট গ্রহণের জন্য দেয়া লাল রংএর পোশাক এবং কবিকে তাতে অপূর্ব লাগছিল। ধীরে ধীরে কবি প্রতীক গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান প্রেসিডেন্ট এবং চ্যান্সেলর মাহমুদুল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছালে ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী কর্তৃক ঘোষণার পর কবিকে প্রতীক প্রদান করা হয়। প্রতীকটি ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের নিকটেই জমা আছে ব'লে জানি। এই অনুষ্ঠানটি তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জনাব মাহমুদুল্লাহর শেষ অনুষ্ঠান। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাদের সম্মুখেই কবিকে প্রতীক প্রদান করে তিনি তার আসনে ফিরে গিয়ে ইস্তফা পত্র সই করে কবির সাথে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে চা পান করেন। এ অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ তথা ঢাকা ভার্সিটি কবিকে প্রথম এরকম একটি সম্মানে ভূষিত করার পর আমারই পত্রের জন্য কবির সম্মানজনক ডক্টরেট প্রাপ্তির প্রতীক প্রদান অনুষ্ঠানটি ভিন্নভাবে হয়েছিল।

চতুর্দশ অনুষ্ঠান

৫ই এপ্রিল ১৯৭৫। রেডিও বাংলাদেশ-এর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী লোক-সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠান। উক্ত উদ্বোধনী দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কবি স্বয়ং। সন্ধ্যের পর এ অনুষ্ঠানে কবি ঘণ্টাখানেক উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অনুষ্ঠান

২৫শে মে ১৯৭৫। নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত হয়েছিল। নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে গাড়ী করে কবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন প্রখ্যাত নজরুল গীতি শিল্পী ফিরোজা বেগম। ফিরোজা বেগম গাড়ীতে কবির পাশে বসে কবির মাথায় হাত বুলিয়ে গান করে কবিকে আনন্দ দিচ্ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী, গণপূর্ত ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেনসহ নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের প্রধান জনাব ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। কবি এ অনুষ্ঠানে প্রায় চল্লিশ মিনিট ছিলেন।

ষোড়শ অনুষ্ঠান

২৭শে মে ১৯৭৫। তদানীন্তন 'বাকশাল' আয়োজিত নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে মহিলা সমিতির মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান হয়। এ অনুষ্ঠানের প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী কবি সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় নজরুল একাডেমীর নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে আগত কোলকাতার প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী শ্রী শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী অধীর বাগচী কবিকে এ অনুষ্ঠানে গান শোনান। এ ছাড়া কোলকাতা থেকে আগত অপর শিল্পী কবির ছাত্রী শ্রীমতী রেণু ভৌমিকও গান পরিবেশন করেন। —এছাড়া স্থানীয় নজরুলগীতি শিল্পী সোহরাব হোসেন, শবনম মুশতারী প্রমুখ নজরুলগীতি পরিবেশন করেন এবং নৃত্যশিল্পী অঞ্জনা রহমান নৃত্য পরিবেশন করেন। সোহরাব হোসেন এবং রেণু ভৌমিকের সঙ্গে তবলায় আমি সহযোগিতা করি। এ অনুষ্ঠানে তদানীন্তন সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, বেতার ও তথ্যমন্ত্রী জনাব কোরবান আলী, আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি সচিব জনাব মুস্তফা সরোয়ার এবং নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কবি তালিম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তবে অনুষ্ঠান শেষে কবিকে দেবার জন্য একটি গাড়ী বহুকষ্টে জোগাড় করা হয়েছিল, যার ফলে কবিকে মহিলা সমিতির মিলন কেন্দ্রের সম্মুখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়।

সপ্তদশ অনুষ্ঠান

৩১শে মে ১৯৭৫। পুরোনো ঢাকার লালকুঠিতে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে। সাহিত্যিক জনাব এম. এ. আজিজ সাহেব অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে কবিকে আমন্ত্রিত করেন। এ অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী সাহেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে কোলকাতা থেকে আগত কবির ছাত্রী শ্রীমতী রেণু ভৌমিক। শ্রীমতী ভৌমিকের সাথে তবলায় আমি সহযোগিতা করেছিলাম। সুন্দর এ অনুষ্ঠানটি কবি সারাক্ষণ উপভোগ করেন। কবি এ অনুষ্ঠানে এসে তাঁর জন্য আয়োজিত সামান্য নাস্তাও খান।

অষ্টাদশ অনুষ্ঠান

১৮ই জুন ১৯৭৫। ধানমণ্ডি সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্কৃতি পরিষদের শিল্পীদের গাওয়া নজরুল-গীতি উপভোগ্য হয়। কবি এ অনুষ্ঠানে প্রায় একঘণ্টা উপস্থিত ছিলেন।

উনবিংশ অনুষ্ঠান

২১শে জুন ১৯৭৫। আলমগঞ্জ আগ্নিবীণা সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের কবি সবটুকুই উপভোগ করেন। এ অনুষ্ঠান আলমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এ অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল দুটো 'ট্রাক' পাশাপাশি করে তার উপরে। সামনে থেকে কারো বুঝাবার সাধ্য নেই। কারণ, ট্রাকের সামনেটা পেছনের দিকে করে পেছনের মাল বহনের স্থানে মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ ফজলুল হক, সোহরাব হোসেন, এম. এ. মন্নান এবং শেখ লুৎফর রহমান। সোহরাব হোসেনের সাথে তবলায় আমি সহযোগিতা করেছিলাম। কবিভবনে থাকাকালীন কবির এটাই বাইরের শেষ অনুষ্ঠানে যোগদান। এ অনুষ্ঠানে কবি সারাক্ষণই ছিলেন এবং অনুষ্ঠান প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী হয়েছিল।

এ ছাড়া কবি রামপুরার জনৈক নূরুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতে কবিসহ তাঁর পুরো পরিবারকে আমন্ত্রণ জানালে কবি সে বাড়িতে এসেছিলেন। এটা ১৯৭২ সালের কোন এক সময় ছিল।

এরপর পিজি হাসপাতালে থাকাকালীন '২১শে পদক' গ্রহণ উপলক্ষে ২৫শে ফেব্রুয়ারী '৭৬-এ কবিকে একবার বঙ্গভবনে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি জনাব এ. এস. এম. সায়েম কবিসহ অন্যান্য পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পদক প্রদান করেন। সামরিক প্রধান এবং প্রধান সামরিক শাসনকর্তা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানও অন্যান্যের

www.pathagar.com

সাথে উপস্থিত ছিলেন। পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে কবি জসীম উদ্দীন ছিলেন অন্যতম। কবি জসীমকে কবি নজরুলের পাশে এক অনুষ্ঠানে এই শেষবারের মত দেখা যায়। কারণ, এর মাত্র ১৮ দিন পর জসীমউদ্দীন ১৪ই মার্চ '৭৬, ৩০শে ফাল্গুণ '৮৩, পবিত্র ১২ই রবিউল আউয়াল, ৯৬ ে মক্কাদুন্নবীর দিনে ফজরের ওয়াক্তে ইন্তিকাল করেন। দিনটি রবিবার ছিল এবং এর সাড়ে পাঁচ মাস পর একই রবিবার দিনে ২৯শে আগষ্ট কবি নজরুলও ইন্তিকাল করেন। তাই বাংলার দুই বিখ্যাত কবিকে একই বছরে একই রবিবারে হারাই। ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬-এ কবি নজরুলকে এদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয় এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী এই '২১শে পদক' প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী সে পদক প্রদান করা হয়। এবং এই অনুষ্ঠানই বলতে গেলে কবির জীবনের শেষ অনুষ্ঠান।

কয়েকটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে মিশে গেছে

বলতে গেলে বাংলাদেশে কবি নজরুল এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলামের পরিবার ঢাকাতে আসার পর থেকেই আমার সাথে তাঁদের পরিচয়। কবি পরিবারের স্থায়ীভাবে থাকার আগে থেকেই আমাদের বাড়ি আর কবি বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের যোগাযোগ ঘটেছিল এবং খিলখিল কাজী, মিষ্টি কাজী, বাবুল কাজীর গান শেখা এবং পড়া-লেখার দায়িত্ব নিয়ে যখন আমাকে কবি-ভবনে একান্ত বাধ্য হয়ে থাকতে হল তখন কবিকে সেবা করার আমার চিরদিনের বাসনা পূর্ণ হবার পথে ভেবে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম। খিলখিল-মিষ্টি-বাপ্পীর এদেশের স্কুলের সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দেই। খিলখিল-মিষ্টিকে ধানমণ্ডি গার্লস স্কুলে এবং বাবুল কাজীকে শাহীন স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম। খিলখিল এবং মিষ্টির গানের নিয়ম মাফিক সঙ্গীত চর্চার হাতেখড়ি আমার কাছেই হয়েছিল। কবি জসীমউদ্দীন একদিন কবিকে দেখতে এসে মিষ্টি কাজীর একটি গান কবি নজরুলের সামনে বসে তাঁকে শোনাবার পর তিনি ওদের গান শেখাই বলে খুব গর্ব বোধ করে বলেছিলেন "কবি নজরুলের নাতনীদের বাংলাদেশের একটি ছেলে গান শেখায়—সত্যি আজ আমার বুক গর্বে ভরে গেল"। এমনকি উমাকাজীও যতটকু গান করতে পারতেন তা আমার জন্যই। খিলখিল-মিষ্টিরা বলতে গেলে কোন অনুষ্ঠানেই আমাকে ছাড়া যেত না এবং গান করত না। কারণ, ওরা হারমনিয়ম বাজিয়ে গান করতে পারত না, আমাকেই হারমনিয়ম ফলো করতে হত। শুধু তাই নয়, ওরা আমার উপর অনেকটা নির্ভর করত এবং ওরা যে ক'বছর এখানে ছিল সে ক'বছর কবিকে

www.pathagar.com

গান শুনিয়ে আনন্দ দেবার একটা নিয়ম করে নিয়েছিলাম। বাংলাদেশে এসে কবি বিশেষ করে এত বেশী গান শুনেছেন যে, সেই গান শুনেই কবির স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এই একটিমাত্র উপকরণ ছিল যা কবি সবচাইতে ভালবাসতেন। বাইরের কোন শিল্পীকে নিজে থেকে আগ্রহ করে গান শোনাতে দেখিনি, বিশেষ করে যারা এখন কবির গান গেয়ে প্রসার করেছে। তাদের অনেককে দাওয়াত পর্যন্ত করেও কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়ে যেতে দেখিনি। যে দৃশ্যটা বলতে গেলে অনেকেই দেখেছেন বা অনেককে দেখেছি সে দৃশ্য দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন আমাকে গান করতে—সেই গান শুনে কবি কি রকম করেন—সেই দৃশ্য বলতে গেলে প্রত্যহই নিত্য নতুনভাবে দেখেছি। কবি গান শুনে হাসতেন—বেশী হাসলেই চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিত এবং তা গড়িয়ে পড়ত। বেশী আনন্দ প্রকাশের সময় মাথা চুলকাতেন বা মাথায় নিজের হাত (ডান হাতই ব্যবহার করতেন) বুলাতেন—সামনের থেকে হারমনিয়ম-এর উপর রাখা খাতা টেনে নিয়ে স্বভাবত জিভে আঙুল ভিজিয়ে পাতা ওল্টাতেন—ফিরিয়ে দিতেন—কিম্বা খাটের মাথার ওপাশে (আমি যাকে ব্যাঙ্ক বলতাম) ফেলে দিতেন। হয়তো বা কোন কোন দিন আবার তুলে নিতেন সেখান থেকে। হারমনিয়ম বাজানো বন্ধ করলে কবি বাইরের বারান্দায় চলে যেতেন কিম্বা বাইরের বারন্দায় গিয়ে বসে থাকতেন। ভেতরে হারমনিয়ম বেজে উঠলেই কবি চলে আসতেন—এসেই বসতে ইঙ্গিত করতেন হারমনিয়ম দেখিয়ে গান করবার জন্য। কিম্বা গান হচ্ছে, শিল্পীর পাশে তবলা রয়েছে কিন্তু তবলচী নেই—দাঁড়ানো কাউকে ইঙ্গিত করতেন, তবলা দেখিয়ে হাতের ইশারা করে, সেই তবলা সঙ্গত করতে; কিম্বা তবলচী তবলা সামনে রেখে বসে আছে, শিল্পী গান করছে সেরকম মুহূর্তেও তবলচীকে তবলা বাজাতে ইঙ্গিত করতেন হাত বাড়িয়ে। এই ইঙ্গিতগুলো সাধারণত ডান হাতেই করতেন, কারণ, অসুস্থ হবার পর কবির বাঁ দিকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো হারমনিয়ম সামনে রেখে শিল্পী বসে আছেন কিম্বা হারমনিয়ম তবলা সামনে পড়ে আছে—অথচ সবাই দাঁড়িয়ে সে রকম সময়তেও কবি ঐ দাঁড়ানো সবাইকে হাতের ইশারা করতেন হারমনিয়ম-তবলা দেখাতেন ওগুলোর ব্যবহার করতে। কবি খুব জমজমাট গান বেশী ভালবাসতেন। কারার ঐ লৌহ কপাট, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, আজ রক্ত নিশিভোরে, চল্ চল্ চল্, টলমল টলমল পদভরে, বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা, ইত্যাদি এ জাতীয় গানগুলো তবলা সহযোগে খিলখিল-মিষ্টি—আমি যখন কোরাস গাইতাম তখন কবিকে দেখেছি সবচাইতে বেশী আনন্দ পেতে। কবির সে খুশী—সেই হাসির ঝলক শুধু স্মৃতি

www.pathagar.com

হয়ে থাকবে চিরদিন। কবি হাসপাতালে ভর্তি হবার এক মাসের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার অনেক কারণের মধ্যে এই গান শুনতে না পারাই প্রধান কারণ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কবিকে যদি দু'বেলা গান শোনাবার ব্যবস্থা করতেন তবে কবি এতটা অসুস্থ হয়ে পড়তেন না এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে টেপ-রেকর্ডার দিয়ে কবিকে গান শোনাবার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ জাতীয় গানে কোনদিনই কবিকে আনন্দ পেতে দেখিনি। কারণ, শিল্পী কবির সামনে বসে গান গাইলে কবি সেই পারফরমেন্স উপলব্ধি করতেন—রেডিও, টেপরেকর্ডার কিম্বা রেকর্ড প্লেয়ার সহযোগে গান কোনটাতেই কবি আনন্দ পেতেন না। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কবি কিসে খুশী হন তা না জেনে এ পদ্ধতিতে কোনই উপকার হয়নি। কবির সামনে নাচলে কবি আনন্দিত হতেন। কিন্তু আবৃত্তি তা যতই হাত-পা নেড়েই করা হত না কেন তাতে কবি আনন্দ পেতেন না। আমি হাসপাতালে প্রায়ই যেতাম— এই সময় কবিকে গান শোনাতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল অনুমতি পেলে হারমনিয়ম এনে গান করব। অনুমতি চাইতে গেলে আমাকে বলা হল application করে proper channel-এ আসতে। এ রকম অদ্ভুত কথায় আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির সাক্ষাতের সময় অনেককে বলতে শুনেছি 'আচ্ছা দেখি ভাই'—এরকম কথা বলে এড়িয়ে যেতেন, আবার অনেকে বলতেন "ভাই কবিকে যে এভাবে কল্পনা করতেই পারি না'। এ পর্যন্তই। মরহুম জনাব আবুল মনসুর আহমেদ এবং মরহুম জনাব ইব্রাহীম খান (প্রিন্সিপাল) সাহেব অনেক দুঃখ করেছিলেন—দুঃখের বিষয় তাঁদের অনেক কিছু করার মত আগ্রহ লক্ষ্য করেও অসুস্থতায় তা করে উঠতে পারেন নি। কবির জন্মদিন ছাড়া বলতে গেলে কোন সাংবাদিক কিম্বা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দেখিনি কবির খোঁজ-খবর রাখতে—কবির ধানমণ্ডির ভবনে কি অবস্থায় রয়েছেন কবি। অনেককে দেখেছি জন্মদিনে কবির পাশে এসে চোখের পানি ফেলতে। বছরে বারটি মাসে সময় করতে যাঁরা পারেন না তাঁরা কি করে ঠিক জন্মদিনটিতে সময় করেন কবির পাশে কাঁদবার জন্য? মনে পড়ে কোন এক দৈনিকের জনৈক সাংবাদিককে কবির ৭৬তম জন্মজয়ন্তীতে প্রশ্ন করেছিলাম—"আপনাদের মানে সাংবাদিকদের চেহারা কেবলমাত্র কবির জন্মদিনেই দেখা যায়—কিন্তু সারা বছরের অন্যান্য দিন কবির কি রকম যাচ্ছে তার কি খোঁজ নেয়া এবং তা পত্রিকায় প্রকাশ করা উচিৎ নয় কি? জবাবে বলেছিলেন—"হ্যাঁ একশবার উচিৎ"। কিন্তু ও পর্যন্তই।

www.pathagar.com

একবার কবিকে সকালে গান শোনাচ্ছিলাম—কবির নাতনী মিষ্টি কাজী এসে আমার পাশে বসল। গান শেষ হলে মিষ্টিও একটি গান ধরল। গান শুরু করলে কবি বারংবার ধমক দিচ্ছিলেন। কেন ধমক দিচ্ছেন বুঝতে না পেরে আমরা গান রেখে আবার শুরু করলাম গান। কিন্তু নাহ, কবি আবারও ধমক দিয়ে উঠলেন এবং দুহাতে তালি দেয়ার মত করে হাত দিয়ে ইশারা করে মিষ্টির পা দেখিয়ে দিচ্ছেন—পরে বুঝতে পেরে লক্ষ্য করলাম মিষ্টির পায়ে জুতো রয়েছে—জুতো পরে গান করতে নেই—এ ব্যাপারটি কবি ঐ অবস্থায়ও ভুলে যাননি। মিষ্টি সাথে সাথে জুতো খুলে নিল—এরপর খুশীতে মিষ্টি ও আমি দাদু (কবি)-কে চুমোয় একাকার করে দিয়ে আবার গান করতে বসেছিলাম। গানকে কবি কত ভালবাসতেন এটা তার একটা নজির বলা যায়।

কবির জীবনের শেষ জন্মজয়ন্তীতে, যেটা হাসপাতালে কবির অবস্থানকালে হয়েছিল, তাতে কবিকে 'নজরুল একাডেমী' থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর অনুমতি চাইতে বেশ ছুটাছুটি করতে হয়েছিল। সে ছুটাছুটি বিশেষ করে আমাকেই করতে হয়েছিল নজরুল একাডেমীর পক্ষ থেকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একবার বলেছিলেন "আমরা এখনো ঠিক করিনি কবিকে সেদিন কিভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া হবে"—আবার বললেন 'মিনিস্ট্রি থেকে অনুমতি আসেনি", আবার বলেছিলেন "মিনিস্ট্রি থেকে অনুমতি নিয়ে আসুন"। বলেছিলেন "কবির স্বাস্থ্য ভালো নেই"। "বোর্ড বসার পর ডিসিশন নেয়া হবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর মিনিস্ট্রির অনুমতি নেয়ার পরও হাসপাতালের অনুমতি বহু কষ্টে পাওয়া গেল এভাবে,—"মাত্র কয়েকজন আসতে পারবেন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে"। অবশেষে জন্মদিনে গিয়ে দেখলাম কবি তখনো (বেলা দশটা হবে তখন) তাঁর ১১৭ নং কেবিনে। নীচের তলার হল রুমে নিয়ে যাবার অনুমতি তখনো হয়নি। শেষে অনুমতি হল। সে যাক, শুধুমাত্র শ্রদ্ধাঞ্জলিতে দুটো হামদ নাত শোনাতে এমন কি অশুদ্ধ হত? এই সময় হাসপাতাল সুপার ছিলেন ডঃ এ. আর. খান এবং পরিচালক ডঃ নূরুল ইসলাম। ইচ্ছে করলেই জন্মজয়ন্তীতে সবাইকে সময়ের ভিত্তিতে মাল্য দান এবং গান শোনানোর ব্যবস্থা হতে পারত—আফসোস্ শেষ জন্মজয়ন্তীতে কবি গান শুনতে পারেন নি।

কবির খাওয়া-দাওয়ার সময়ের কিছু কথা বলা দরকার। খাওয়ার থালা ইত্যাদিসহ যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করা হত তখন তাঁকে প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায় কাৎ হয়ে শুয়ে মাথার নীচে বাঁ হাতখানা দিয়ে যেভাবে সাধারণত শুয়ে রইতেন

www.pathagar.com

সেভাবে পাওয়া যেত—কিন্তু যদি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতেন তবে মাথা উচু করে খাবার লক্ষ্য করতেন এবং ইশারা করতেন তাঁকে তুলে দেবার জন্য হাত এগিয়ে দিয়ে। খাওয়াটা তাঁকে পরিমাণ মতই দেয়া হত। বাংলাদেশে আসার প্রথম অবস্থায় হাত দিয়ে তাঁকে খাইয়ে দেয়া হত—পরে চামচে দিয়ে খাইয়ে দেয়া হত। খাওয়ার সময় যদি দু একটা ভাত পাশে পড়ে যেত তবে কবি সে ভাত হাত দিয়ে থালাতে তুলে নিতেন। কষ্ট হত কবির হাত দিয়ে ভাত তোলার দৃশ্য দেখে, কারণ একেতো হাত কাঁপত তদপরি নখ সাধারণত তুলনায় একটু বড় ছিল বলে সে ভাত তুলতে তাঁকে অনেকক্ষণ চেষ্টা করতে হত। কিন্তু তবুও তুলতেন—ভাতের প্রতি তাঁর এ হেন মায়া ছিল।

মিষ্টি খেতেন তিনি প্রচুর। বাংলাদেশে আসার প্রথম দিকেও তাঁকে মিষ্টি খেতে বারণ করা হত না। কোন ভক্ত শ্রদ্ধাভরে মিষ্টি (সন্দেশ, গোল্লা-অমৃতি ইত্যাদি) দিলে তশতরীতে তুলে ভক্তের অনুরোধে তার সামনে কবিকে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হত—কিভাবে কবি খেয়ে নেন তা দেখার জন্য। চামচ দিয়ে কেটে কেটে কবির মুখে তুলে দিতে হত। তশতরীতে দেয়া মিষ্টি ফুরিয়ে গেলে কবি আবার ইশারা করতেন আরো মিষ্টি দেবার জন্য। এ ইশারাটা সাধারণত চোখ দিয়ে করতেন তশতরী লক্ষ্য করে। পাশে মিষ্টির ভাণ্ড থাকলে সেটাও দেখাতেন—এবং আবার দিতেও হত। পরে কবির ডায়েবেটিস ধরা পড়লে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও মাঝে মধ্যে দু-একজন ভক্তের শ্রদ্ধাভরে নিয়ে আসা মিষ্টি কবিকে দেয়া হত।

কি করে পানি খেতে হয় গ্লাস তুলে, কি করে চামচ দিয়ে খেতে হয় দেখিয়ে দিলে কবি কিছু কিছু অভ্যেস করেও নিয়েছিলেন। তবে গ্লাসে তুলে পানি যতটা ভালভাবে খেতে পারতেন, চামচ দিয়ে তা পারতেন না। ৪/৫ বার চামচ তুললেই হাতের কাঁপুনিতে রেখে দিতেন।

এই খাওয়া নিয়ে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। দিনটি ছিল পবিত্র সবে-বরাতের। কবিকে রাতের খাবার দিতে একটু বেশীই দেরী হয়েছিল। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। মশারি তুলে কবিকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে—কবি বসেছেন। লুৎফুন্নেসা লুৎফা গিয়েছিল কবিকে খাওয়াতে। একটা কথা বলে নেই—এই লুৎফা কবিভবনে কাজ করতেন—কবিকে ভালো-বাসতেন। ফরিদপুরে বাড়ী এই লুৎফা কবিকে বেশ আদর-যত্ন করতেন। সে যাক, কবির সামনে খাওয়া নিয়ে যেতেই কবি থালা এত জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন যে ভাত ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই খাবেন না কবি। অগত্যা

www.pathagar.com

আমাকে ডাকা হল কবির পাশে। গিয়ে দেখলাম ভাত ছড়িয়ে রয়েছে। কবির চেহারাতে রাগের চিহ্ন। কাছে গিয়ে বসলাম। কবিকে অনেকবার আদর করে বল্লাম "দাদু খেয়ে নিন"। অনেক বোঝালাম। ইতিমধ্যে খিলখিল-মিষ্টিও এসেছিল, ওরাও দাদুকে খুব আদর করে খেয়ে নিতে বলল। অবশেষে কোন-রকমে দাদুর মান ভাঙল। কবির এরকম করার কারণ তাঁকে দেরী করে খেতে দেয়া। উল্লেখ্য তাঁকে বসিয়ে তাঁর থেকে একটু দূরে খাওয়ার থালা রাখলে ইশারা করে দেখিয়ে দিতেন খাবার এনে দেবার জন্য। আর দুষ্টুমি করে তার থালা থেকে তার খাবার মুখে তুলে নেবার মত করতাম তবে রেগে যেতেন—ধমক দিতেন। এবং বার বার চোখ ফিরিয়ে তাকাতেন। খাওয়ার সময় কোন রকম দুষ্টুমি পছন্দ করতেন না। খাওয়ার মাঝে পানি খেতেন খুব কম তবে খাওয়ার পর খেতেন। কোন ট্যাবলেট জাতীয় ঔষধপত্র ভাতের সাথে দিয়ে দিতে হত। পাউডার কিম্বা লিকুইড হলে মুখে দিলেই খেয়ে নিতেন, কোন অসুবিধে হত না।

বিশ্রাম এবং ঘুমের সময়তেও কবির কতগুলো ব্যাপার লক্ষ্যণীয় ছিল। কবির বিশ্রামের সময়গুলো ছিল সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত, দুপুরের খাবারের পর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত, সন্ধ্যের পর থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এবং রাতের খাবারের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত। প্রথমেই বলে রাখছি কবি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন। বিশ্রামের সময়ে কবি সাধারণত ঘুমিয়েই কাটাতেন। তবে দুপুরের খাবারের পর যেটুকু বিশ্রাম নিতেন তাতে আমরা কবিকে শুইয়ে দিতাম এবং কবি ভাল ঘুমাতেন। বিশ্রামের অন্যান্য সময়গুলোতে কবি একাকী যেভাবে বিছানায় গা' এলিয়ে দিতেন তেমনি বাঁ দিকে কাৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। এ সময় সাধারণত তাঁকে বিরক্ত করা হত না। মাঝে মাঝে প্রস্রাবের কাপড় পাল্টাবার জন্য যেতে হত। উল্লেখ্য কবিকে হাসপাতালে নেয়ার পেছনে যে রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল সে রিপোর্টে কবি ভিজে কাপড়ে ছিলেন বলে উল্লেখ ছিল। বলে রাখা দরকার প্রস্রাবের কাপড়ে কবি কিছুক্ষণ থাকলেও এতে কবির কোন খারাপ হত না এবং হয় নি। হঠাৎ করে দেখলে যারা জানেন না তাদের চোখে খারাপ হয়তো লাগত। কিন্তু জেনে নিলে খারাপ লাগার কোন কারণ থাকত না।

কবির কাছে রাত দুটা-তিনটার দিকে গেলে মশারির ভেতর দিয়ে তাঁকে দেখা যেত তিনি একভাবে উপরের পানে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করছেন। এবং কেউ যে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করেছে এতে তাঁর সেই ধ্যানের ক্ষতি হত না কোন। চোখের কোণে একটু হাসি নিয়ে বাম হাতখানা মাথার নীচে রেখে

www.pathagar.com

কবি চিন্তার সাগরে নিমগ্ন থাকতেন। কি চিন্তা করতেন, কি ধ্যান করতেন যার জন্য এত রাতেও তাকে জাগ্রত পাওয়া যেত? তাহলে তিনি কি সব বুঝতেন? এ প্রশ্নের সমাধান এখনো পাইনি। হয়তো যে ঘটনা লিখতে যাচ্ছি তাতে এর কিছু জবাব থাকতে পারে। কবি তখন কোলকাতায়। সি আই টি ফ্ল্যাটে তাঁর বাস। সেখান থেকে ১৯৬৪ সালে চুরুলিয়ায় একবার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখানে তাঁদের বাড়ির মাজারে যেতে যেখান থেকে জুতো খুলে রেখে যেতে হয় সেখান থেকে তাঁর জুতো না খুলে দেয়া পর্যন্ত একটুও এগোন নি, দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারো স্মরণ ছিল না যে তার পায়ে জুতো রয়েছে, কবি তাঁর পায়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর পায়ে জুতো রয়েছে—অবশেষে জুতো খুলে দিলে তিনি মাজারের পাশে যান।

৩০ জুন কবি পত্নী বেগম প্রমীলা নজরুল ইসলামের মৃত্যু দিবস। ১৯৬২ সালের এই দিনে তিনি মারা যান। এবং প্রিয়তমার লাশ কক্ষ থেকে যখন বের করা হচ্ছিল তখন কবিকে দেখা গেছে ইতস্তত তাকাতে—চোখের কোণে পানি—তাকিয়ে আছেন ফ্যাল ফ্যাল করে—লাশটি নিয়ে যাচ্ছে যে পথ দিয়ে সেই পথে। বাংলাদেশে '৭২ সালের ৩০ জুনও দেখেছি কবি পত্নীর মৃত্যুর দশ বছর পরও কবির চোখে পানি।

কবির ছোট ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম যিনি কোলকাতায় ১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মারা যান, সেই দিন দিবাগত রাতের একটা ঘটনা বলছি। কবিকে বলেছিলাম আমরা যে তাঁর ছেলে মারা গেছেন। কিন্তু যখন তাঁকে বলা হল তখন কোন কিছুই বোঝা যায় নি। কবিকে বেদনাহত বা দুঃখিত হ'তে দেখা যায়নি। কিন্তু রাত দুটোর দিকে তাঁর কাছে যেতে দেখেছিলাম তিনি একা একা কাঁদছেন—উপরের পানে তাকিয়ে—তাই এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় কবি নিশ্চয়ই কিছু বুঝতেন। এরকম তিনি অন্যান্য দিন করতেন না।

কবি এক সময় খুব ভাল দাবা খেলতেন। এসব লক্ষ্য রেখেই তাঁর সামনে একবার দাবার বোর্ড পাতা হল—দাবার বোর্ড সামনে রাখলে কবি কি রকম করেন তাই লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু কবি দাবার বোর্ড আর গুটিগুলোর পানে সামান্য কিছুক্ষণ তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন অন্যত্র। ঐ সামান্যক্ষণ তাকানোর মধ্যে কি কবি তাঁর দাবা খেলার সাথী ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন কিম্বা কোলকাতার বৌ বাজারের সতীশ আডিড কিম্বা দাবা খেলার জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাওয়া আসার কথা মনে করছিলেন?

www.pathagar.com

এবার একটা মজার ঘটনা বলছি, কবিকে সকাল বেলা গান শোনাচ্ছিলাম : একজন ভক্ত কবিকে দেখতে এলেন—দেখতে ঠিক নয়, এসেছিলেন দোয়া দরূদ পড়তে। বললাম—বেশ। তবে কবির গায়ে হাত দিয়ে নয়, কারণ, এর আগে অনেকেই এমন এসেছেন, অনেককে বারণ করেছিলাম, অনেক দোয়া দরূদ পড়েছেন সেই সাথে যেভাবে কবির শরীর নিয়ে টানাটানি করেছেন সেসব ভালো লাগেনি বলেই আগে থেকেই কবির শরীরে হাত লাগাতে বারণ করেছিলাম। তাছাড়া লোকটিকে দেখেও আমার ভালো লাগেনি। যা হোক মিনিট পনেরো দোয়া-দরূদ পড়ে লোকটা চলে গেল। ঘণ্টা খানেক পরে কবিভবনে নিযুক্ত পুলিশ প্যাট্রলের নায়েক এসে আমায় বললেন, কবি নাকি কথা বলছেন? বললাম, এইমাত্র কবিকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় রেখে দরজা বন্ধ করে তবে এলাম—তা' বললে কে? ইনি বলেছেন, বলে সে লোকটাকে দেখিয়ে দিল। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলে বললে, কোরান সত্য হলে কবি কথা বলছে কবির রুমে গিয়ে দেখুন। লোকটিকে সাথে করেই উপরে কবির কক্ষে গিয়ে দেখি কবি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—ডেকে জাগালাম স্বভাব সুলভ দাদু দাদু বলে। উঠলেন কবি যেমনটি, তেমন ভাবেই। বললাম কোরানকে নিয়ে এ জাতীয় কথা বলার সাহস কোথায় পেলেন? পরে লোকটিকে অনেক নাজেহাল হয়ে চলে যেতে হয়েছিল।

এই ঘটনাটিতেও পাঠকবর্গকে হাসির উদ্রেক করবে হয়তো : ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক সময় হঠাৎ করে এক মহিলা, বছর পঞ্চাশেক বয়সের হবে, এসে দাবী করলেন তিনি কবির স্ত্রী এবং তিনি কবিকে সেবা করতে চান এবং তার এ সেবা দোয়া দরূদের মাধ্যমে হবে। আমার সঙ্গে আলাপ করতে পাঠালে নাম জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, উম্মে সালমা সামিতুন নেসা নূরে খোদা। বললাম, এ নামে তো কবির কোনকালে কোন স্ত্রী ছিল না? আর কবিতো একটাই বিয়ে করেছিলেন। জবাবে বললেন, তাদের বিয়ে হয়েছিল আধ্যাত্মিক ধ্যানের মাধ্যমে। জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে—সেটা আবার কি রকম বিয়ে? জানালেন—কবি যা-ই লিখতেন সব আধ্যাত্মিক ধ্যানে তার কাছে চলে যেত এবং কবির সমস্ত লেখাই এই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে। জিজ্ঞেস করলাম—জীবনে কবিকে আর দেখেছেন?—না, বলে জবাব দিলেন। বললাম—তাহলে বিয়ে কি করে হল? জবাবে বললেন—তা বুঝবেন না। এবং তিনি কবিকে দেখার জন্য তাই ছুটে এসেছেন, কবি এখানে এসেছেন জেনে। বললাম, কবি ঢাকাতে এসেছেন তা-ও আজ প্রায় দু'বছর। যাকে ধ্যান করতেন, যাকে পাবার জন্য ব্যাকুল এবং যাকে দেখার জন্য পাগল হয়েছিলেন, আর ঢাকাতে

www.pathagar.com

তিনি এসেছেন এ খবর পেলেন দু'বছর পর? জারিজুরি সমস্ত ধরা পড়ে গেল। এবং পরে চলেও গেল। এই মহিলাকে আবার দেখা গিয়েছিল কবির ৭৬তম জন্মজয়ন্তী উৎসব কবিভবনে উদযাপনের সময়। হঠাৎ করে সকালের দিকে কবিকে এসে জড়িয়ে ধরেছিল। পুলিশ দিয়ে ছাড়িয়ে তবে সরিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর এই মহিলাকে আর দেখিনি।

একবার কবির ঠিক পাশে বসে এক ভদ্রলোক সিগ্রেট পান করছিলেন—কবি সে সময় টিভি দেখছিলেন। বসে বসে টিভি দেখার মধ্যেই কবি ধমক দিচ্ছিলেন সিগ্রেট ফেলে দেবার জন্য। অবশেষে সিগ্রেটটা ভদ্রলোকটির হাত থেকে টেনে নিয়ে কবি ফেলে দিয়েছিলেন।

কবিকে চায়ের অভ্যাস করিয়েছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যেয় টিভি দেখার সময় এক কাপ করে চা দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তশতরীতে ঢেলে দিলে নিজেই পান করতে পারতেন হাতে করে তুলে, তবে কাপে করে পান করতে পারতেন না। আমার মনে হয়, কবি যে সময় চা-তে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন সে সময়ে তিনি এভাবেই চা পান করতেন। অনেকের মুখে আমি তা-ই শুনেছিলাম। আর তাই বোধ হয় তিনি চা তশতরীতে ঢেলে পান করতে ভালবাসতেন। চিনি দিয়েই চা দিয়ে থাকতাম। কোন কোন দিন দু'তিনবারই চা-য়ে চিনি মিশিয়ে দিতাম, কিন্তু ডায়বেটিস থাকা সত্ত্বেও তার শরীর খারাপ করেনি।

কবির গাড়ীতে চড়ার আনন্দ-মাখা চেহারাটি বারে বারে মনে পড়ে। গাড়ীতে চড়লে কবি নামতেই চাইতেন না। গাড়ীতে করে কবিকে নিয়ে গুলশান লেক এলাকা, মীরপুর, কুর্মিটোলা, সেকেণ্ড ক্যাপিটাল যেতাম। এ সময় তাঁকে খুব উৎফুল্ল দেখাত। হাসতেন—হাত দিয়ে মাথায়-নাকে-মুখে হাত বুলাতেন। বেশী খুশী হলে এরকম করতে লক্ষ্য করা যেত। কবির যে সময় গাড়ী বরাদ্দ ছিল না সে সময় ২৭ মে'৭৫-এ নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'বাকশাল' আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার জন্য যে গাড়ী পাঠানো হয়েছিল অনুষ্ঠানে যাবার পূর্বে কবি অনেকদিন পর চড়ে খুশী হয়েছিলেন বলে বেশ কিছুক্ষণ সে গাড়ীতে করে কবিকে বেড়ানো হয়েছিল। কবি বাংলাদেশে আসার পর যে গাড়ী কবির জন্য এ্যালট করা হয়েছিল তা মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু কয়েকদিন পর গাড়ী পাল্টিয়ে অন্য গাড়ী দেয়ায় এবং সে গাড়ীর অবস্থা খারাপ থাকাতে প্রায়ই আসত না এবং অনিয়মিতভাবে আসত। এতে কবির ছোট নাতনী মিষ্টি কাজীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার

www.pathagar.com

ফলে পরবর্তী সময় 'গাড়ীর অভাব' দেখিয়ে গাড়ী বন্ধ করে দেয়া হয়। কথা কাটাকাটির সময় 'সরকারী পুলের' পদস্থ কর্মচারীটি টেলিফোনে বলেন 'কবির গাড়ীতে কবি কতক্ষণ চড়েন'? অথচ পতাকাসহ গাড়ী পরিবার-সহ বেহিসাবীভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে এদের কণ্ঠ বন্ধ। এরপর '৭৩ সালের জন্মদিনের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় থেকে একটি গাড়ী দেয়া হয়েছিল। দৈনিক দু'গ্যালন করে প্যাট্রল বরাদ্দ ছিল। সে-গাড়ীও বন্ধ হয়ে গেল। এতে যে কবির গাড়ীতে চড়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলেন সে খবরটা কেউ রাখেন নি? কবির জন্য প্রয়োজনীয় টেলিফোন, গাড়ী বন্ধ করে দেয়াতে মনে হয় এ-গুলো দেয়া হয়েছিল কবি পরিবারকে কবিকে নয়। ধীরে ধীরে পরিবারের সদস্যরা চলে যায় আর ধীরে ধীরে বিভিন্ন অজুহাতে একে একে সব বন্ধ হয়ে যায়। কাজী নজরুলের মত রাষ্ট্রীয় অতিথির কি কি অসুবিধে কিম্বা তিনি কিসে খুশী হন সে খবর সর্বজনবিদিত হলেও কবিকে আর ঐ সব দেয়া হয়নি। টেলিফোন এবং গাড়ীর প্রয়োজন সম্পর্কে আমি কবিভবনে অনুষ্ঠিত শেষ জন্মদিনে সাংবাদিকদের বলেছিলাম। এটা পত্রিকাতে প্রকাশিত হলেও কোন ফল হয়নি।

১৯৭৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঐ বছরের কুরবানীর ঈদ ছিল। এ উপলক্ষ্যে কবির নামে কুরবানীর জন্য কবি নজরুলের বই বিক্রি করে এমন সব পাবলি-শার্সদের কাছে সাইকেলে করে দৌড়াদৌড়ি করেছিলাম। কিছু দেবেন বলে আশ্বাস যদিও পেয়েছিলাম কিন্তু তাতে কুরবানী হবে কিনা সন্দেহ ছিল। এই ফাঁকে তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের একজন ব্যক্তিগত সচিবের সাথে (শেরে-বাংলা নগরের প্রেসিডেন্ট অফিসে) ফোনে যোগাযোগ করার এক পর্যায়ে জানালেন একটু রুষ্ট কণ্ঠে "কুরবানীর ঈদে এরকম ধার করে কুরবানী দেয়া যায় না বুঝলেন"। বলে ফোন ছেড়ে দিল। ফোন ছেড়ে আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ঐ সচিবের কথায় মনে হল টাকাটা বোধহয় তার নিজের। এটা যে কবির প্রাপ্য টাকা সেটা তিনি জানতেন না। আর কবির প্রাপ্য টাকা কবি নিশ্চয়ই চাইবেন। উল্লেখ্য প্রতি কুরবানী ঈদেই সরকার কবিকে টাকা বরাদ্দ করতেন। যাক, ঐ পদস্থ কর্মচারী পদের ভারে কাকে কি বলতে হবে তাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। অবশেষে হঠাৎ করে সে সময়ের সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক জনাব ইউসুফ আলী সাহেব ২৩ ডিসেম্বর দুপুরে কবির খোঁজ নিতে এলে সমস্ত জানালাম। ২৫ ডিসেম্বর বড় দিন উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট কবির জন্য এক হাজার টাকার একটা চেক আমার নামে করে

www.pathagar.com

আমাকে ডেকে নিয়ে টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। দু'টো খাসী কিনেছিলাম কবির নামে কুরবানীর জন্য। প্রেসিডেন্ট বিকেলে লোক পাঠিয়েছিলেন কবির জন্য কুরবানীর কি ব্যবস্থা করেছিলাম তা জানবার জন্য।

কবি তাঁর নাতি-নাত্নীদের কতটা ভালবাসতেন এখানে তার উল্লেখ করব। সকালে কবি শুয়েছিলেন। পাশের চেয়ারে বসে মিষ্টি কাজী এবং আমি গল্প করছিলাম। আমাদের গল্পের ফাঁকে কবি বিছানা ছেড়ে উঠলে মিষ্টি গিয়ে কবির বিছানায় সটান শুয়ে পরল। কবি একটু পায়চারি করে ফিরে এসেই মিষ্টিকে তাঁর বিছানায় দেখে কাছে এসে প্রথমে নিজের মাথা চুলকালেন এবং বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। তারপর ধীরে ধীরে মিষ্টির পায়ের কাছে গিয়ে বসলেন। কিছু পরে কবি আবার উঠে পড়লে মিষ্টিকে উঠে আসতে বললে মিষ্টি উঠে এলে ওর পরিবর্তে কবির বিছানায় আমি সটান শুয়ে পড়লাম। পায়চারী করতে করতে কবি ফিরে এসে দেখলেন মিষ্টি বিছানায় নেই পরি-বর্তে রয়েছি আমি। কাছে এসে আগের মত মাথা চুলকালেন এবং বিড়বিড় করে কি যেন বললেনও, তারপর ধীরে ধীরে পূর্বেকার মত পায়ের কাছে না গিয়ে আমার হাত ধরে ওঠাবার জন্য টানাটানি করলেন। আমি সাথে সাথে উঠে পড়লে কবি বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। এটুকুতেই কিছুটা উপলব্ধি করা যায় কবি তাঁর নাতি-নাতনীদের কিরূপ ভালবাসতেন। শোনা যায় কবির সামনে নাতি-নাত্নীদের মারতে উদ্যত হলে মা-বাবার কাছ থেকে দৌড়ে দাদুর (কবি) কাছে দাদুকে জড়িয়ে ধরলে দাদু আড়াল দিতেন।

কবি মাঝে মধ্যে নিজের ইচ্ছাকেও প্রাধান্য দিতেন। বিশেষ করে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময়। মাঝে মধ্যে কিছুতেই তিনি উঠতে চাইতেন না—তখন তাঁর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হত। এবং ইচ্ছা করেই নীচের ড্রইং রুমে গিয়ে বসতেন। সাধারণত ড্রইং রুমটার (নীচের তলায়) দরজা খোলা থাকলেই কবি এরকমটা করতেন। তাই লনে পায়চারির পরেপরেই কবির উপরে তলায় ওঠার পূর্বে ড্রইং রুমের দরজা খোলা থাকলে বন্ধ করে দেয়া হত।

কবি মাঝে মাঝে কবিভবনের সামনের ২৮ নং রোড দিয়ে কিছুদূর হেঁটে হেঁটে চলে আসতেন। সাথে একজন থাকতাম। কিন্তু ফেরার পথে কবিকে ছেড়ে তাঁর আগেই চলে আসলে লক্ষ্য করতাম কবি তাঁর বাড়ির দরজা চিনতে পারেন কিনা। প্রতিবারই তাঁর বাড়ির দরজা ঠিকই চিনতে পারতেন—ভুল করেন নি কোনবারও।

www.pathagar.com

একবার রেডিও বাংলাদেশ থেকে 'শাপলা শালুক'-এর ছোট ছোট ভাইয়েরা পহেলা বৈশাখ ১৩৮২ তে এসে কবিকে গান, কবিতা আবৃত্তি নাচ করে বেশ আনন্দ দিয়ে গেছে—কবি বেশ উপভোগ করেছিলেন ছোটদের এ অনুষ্ঠানটি। কারণ, বাচ্চাদের কবি খুব ভালবাসতেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কবিকে যে সকল বাচ্চা শ্রদ্ধা জানাতে আসত তাদের মধ্যে অনেকেই ভয় পেয়ে কবির কাছে যেত না—কিন্তু যে বাচ্চাই কবির কাছে যেত তাদেরকে কবি ধমক দিতেন না।

অনেক ভক্তের পানে দেখা গেছে কবি স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হাত স্পর্শ করার জন্য। আবার অনেক সময় এর বিপরীতও লক্ষ্য করা গেছে।

কবি ভয় পেতেন অন্ধকারকে—যদিও পিজি হাসপাতালে ভর্তি হবার কিছু দিন পূর্ব থেকে এই অন্ধকারকে ভয় করা কিছুটা দূর হয়েছিল—অবশ্য ডঃ বি. কে. পন্নীর হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার মধ্যে ছিলেন সে সময়। অন্ধকার ছাড়াও ভয় পেতেন তাঁর দিকে কিছু ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলে। যেমন, তবলা বা বায়া হাতে তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করলে তিনি হাত দিয়ে তা ফেরাবার মত করে উঠতেন। অন্যরকম ভাবেও ভয় পেতেন, যেমন একবার পিজি হাসপাতাল থেকে কয়েকজন ডাক্তার কবিকে 'চেক আপ' করার জন্য একত্রে হঠাৎ রুমে ঢুকে পরে ঝটপট কবিকে শুইয়ে ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি পরীক্ষা করার ফলে কবির প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল উত্তেজনা এবং ভয়ে। কারণ, হঠাৎ ৪/৫ জন অচেনা লোককে এমন করতে দেখেই এটা তার প্রতিক্রিয়া। নইলে অন্যান্য সময় ব্লাড প্রেসার যন্ত্র কবির হাতে লাগালেও ভয় পেতেন না।

কবি রাগ করতেন। হাতের নখ কাটার সময় হঠাৎ করে যদি কেটে গিয়ে রক্ত বের হত কিম্বা শেভ করার সময় যদি কেটে যেত এবং তা থেকে রক্ত বের হতো —কবি রেগে যেতেন। বিশেষ করে সে ক্ষত দিয়ে রক্ত বেশী দেখলে রাগের মাত্রা একটু বেশী লক্ষ্য হত। তবে বেশীক্ষণ এ রাগ থাকত না।

কবির বাম বাহুতে একটা বেশ গভীর ক্ষত ছিল এবং সে ক্ষতটা লক্ষ্য করলে সেটা যে বেশ গভীর তা অনুমান করা মোটেও মুশকিল হত না। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব কাজী মাযহার হোসেন মঞ্জুর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় ওটা 'গুলি'র ক্ষত। তবে কোথায় এবং কেন এমন ক্ষত হলো তার কারণ জানা যায়নি। এর আগে কবি সম্পর্কিত কোন পুস্তকেও এটার উল্লেখ ছিল না। কবির বাম দিকের 'হীপ'-এও একটা ক্ষত ছিল।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করা গেছে কবি ফুলকে খুব ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে কবি ভবনের লনে ফুলের বাগানের পাশে বসলে তিনি ফুল দেখিয়ে দিতেন--হাত বাড়িয়ে ইশারা করে ফুল দেখিয়ে দিতেন—সে ইশারা তাঁর চোখেও ফুটে উঠত। দেখিয়ে দেয়া ফুলটি ছিঁড়ে তাঁর হাতে দিলে তিনি একাগ্র মনে ফুলটি দেখতেন—চোখের কোণে একটু হাসির রেখাও ফুটে উঠত সেই সাথে। এরপর অভ্যেস মত ফেলে দিতেন। যেমন তাঁর গলায় মালা পরালে তিনি সে মালা সাথে সাথে ডান হাত দিয়ে খুলে ফেলতেন। খুলে ফেলার সময় মাথায় আটকে গেলে দু'হাতই ব্যবহার করতেন। ফেলে দিয়ে আবার তা তুলে দিতে ইঙ্গিত করতেও দেখা গেছে। তুলে দিলে আবার ফেলে দিতেন। ফুলের তোড়াও তিনি এমনি গ্রহণ করতেন এবং ফেলে দিতেন।

মাঝে মাঝে কবি যে রুমে থাকতেন তার পাশের রুমে আমাদের কথাবার্তা বা পড়ার আওয়াজ পেয়ে চলে আসতেন একা একা। এসে বসতেন গল্প শুনতেন। কিছু পর একাকীই আবার নিজের রুমে চলে যেতেন। যখনই কবিকে এমন করতে দেখেছি—ভাল লাগত প্রচুর। আরো লক্ষ্য করা গেছে কবি যখন টিভি দেখতেন এবং অভ্যেসে পরিণত হল তখন সন্ধ্যের পর টিভি দেখাতে কেউ তাঁকে নিয়ে না এলে একাকী তাঁর রুম থেকে চলে আসতেন দু'টো দরজা পেরিয়ে টিভি রুমে এবং বসে পরতেন সোফায়। মনযোগের সাথে টিভি দেখতেন, কেউ ডিস্টার্ব করলে তাঁর পছন্দ হত না। টিভি দেখতে দেখতে বসে বসেই তাঁর শরীর সামনে ঝুঁকে পড়তো—এতো মনযোগী থাকতেন টিভি পর্দায়। আর এমনি সময় হঠাৎ কেউ আওয়াজ করলে তিনি তার থেকে জোরে আওয়াজ (ধমক) করে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতেন পরে আবার মনোনিবেশ করতেন।

কবি মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করতেন। বিশ্রাম কিম্বা অন্যান্য সময়েও এ শব্দটা শোনা যেত। কবির ঘুমোবার পূর্ব পর্যন্ত পাশের রুম থেকেও এ শব্দটা পাওয়া যেত।

কাগজ পেলে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার একটা অভ্যেস কবির ছিল। এটা সবাই কিছু না কিছু জানেন, দেখেছেনও। তবে এ অভ্যেসটা বাংলাদেশে আসার পর ধীরে ধীরে কবি একদম ভুলেই গিয়েছিলেন। এর একটা কারণ বলা যায়, কোলকাতায় থাকাকালীন (যতটুকু মনে হয়) কবির সামনে কিছু কাগজ দিয়ে রাখা হত—যার দরুন কবি ঐ কাগজ ছেঁড়ার অভ্যেসটা করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে আসার পর কবিকে গান শুনিয়ে আনন্দ দেয়া হত এবং এতবড় বিরাট পরিবেশের ফলে কবি কাগজ ছেঁড়া ভুলেই গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কবিকে কবিভবনে শরীর 'চেকআপ' করার দায়িত্বে যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ এ. এম. মুজিবল হক, ডঃ এ. কে. নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী এবং ডঃ এম. এ. মান্নান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পিজি হাসপাতালের এই চিকিৎসকবৃন্দকে কবির প্রতি নজর রাখতে দেখা গেছে। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসার সময় ব্রাদার আবদুল ওয়াজিদ খানের কথাও উল্লেখ করতে হয়। উল্লেখ করতে হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডঃ ইউসুফ আলী সাহেবকে।

সংযোজন

শেষ করার আগে লিখব যে কবি আজ দশ বছর হল মারা গেছেন। সেদিন তাঁর দশম মৃত্যু বার্ষিকীও হয়ে গেল। এই দশ বছরে আমরা কবিকে ভুলে যাইনি বলা যায়। কবির মৃত্যুর পর প্রথম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবির কবর জিয়ারতে গেলে সকাল সাড়ে ৭টা অবধি দেখা যায় কবির কবরের চারিপাশে ঘাস বড় হয়ে একাকার হয়েছে। কয়েকজন মিস্ত্রিকে তা পরিষ্কার করতে দেখলাম। কবির কবর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল তারা হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে, কবির জন্মদিনে কবর পরিষ্কার করা কর্তব্য। ঠিক ঐ মুহূর্তে ফটো তোলা নিষিদ্ধ ছিল, কারণ কবরের এমন অবস্থা দেখলে তাদের প্রতি খারাপ ধারণা হতে পারে 'তবু'ও একজন ছবি নিয়েছিল তবে তা প্রকাশ পায়নি। সে যাক্ আজ তা থেকে অনেক ভাল অবস্থা লক্ষ্য করে আনন্দ লাগে। তবে একটা বিষয় আমি উল্লেখ করব সেটা কবির সঙ্গীত নিয়ে এবং এই ছোট্ট লেখাটি দিয়েই আমার লেখা শেষ করব। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব কাজী নজরুলের আবির্ভাব সঙ্গীত জগতে না হলে আজ বাংলা গানের ভাণ্ডার এতটা সমৃদ্ধ হত না। নজরুলের গানকে বাদ দিলে বাংলার সঙ্গীতের রাজ্য বলতে হয় সঙ্গীত-এর বিভিন্নমুখী স্বাদ থেকে দূরে সরে যেতে হত। আমরা নজরুলের সঙ্গীতের ভেতর পাই গজল, মর্সিয়া, হামদ, নাত, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, দোল সঙ্গীত, পল্লীগীতি, কাওয়ালী, মুর্শিদী, ভজন, ঠুমরী, রাগপ্রধান, এবং সেই সঙ্গে পাই আধুনিক সঙ্গীতের পথিকৃৎ হিসেবে। নজরুলের অনেক অনেক গানে আমরা রাগের বিভিন্ন বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি এবং সেই গানগুলিকে আমরা খেয়ালের আঙ্গিকে পাই বলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-এর পর্যায়ে বলে থাকি—যাকে বিশুদ্ধ রাগ-প্রধান সঙ্গীত বলা যেতে পারে অবলীলায়, যার জন্য এই গানগুলি পরিবেশন করতে, লক্ষ্য করা যায় এদেশের রাগপ্রধান বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদেরকে। কারণ, এ গানে এই শিল্পীরা তাদেব সঙ্গীতের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারেন। এ গানে রয়েছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশ্লেষণের বিরাট পরিসর, আলাপের বিরাট

www.pathagar.com

অঙ্গন। ঢিমা তাল থেকে দ্রুত তালে নিবদ্ধ নজরুলের অনেক খেয়াল আঙ্গিকের সঙ্গীত রয়েছে। আমাদের এ দেশীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যশস্বী শিল্পীরা যেমন ভীস্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, দীপালী (নাগ) তালুকদার, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ সঙ্গীতে তাদের খোরাক পেয়েছেন প্রচুর। খোরাক বলতে আমি বুঝাতে চাইছি 'রাগ'কে বিশ্লেষণ করার এ সঙ্গীতে অনেক পথ রয়েছে—বিস্তারের ক্ষমতা রয়েছে।

দু'টি সাক্ষাৎকার এবং একটি লেখা

আমি আমার এই বইতে দুটো সাক্ষাৎকার এবং একটি ছোট্ট লেখা সংযোজন করলাম। সাক্ষাৎকার দু'টি আমারই নেয়া। একটি কিশোর সালু ওরফে কুশা—যিনি কবির সাথে প্রায় ৪৬ বছর ছিলেন—তাঁর। এ সাক্ষাৎকারটি আমি গ্রহণ করেছিলাম ১৯৭৫ সনে এবং এটি বাংলার বাণী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয় ২৬ মে ১৯৭৫ সংখ্যায়। অপরটি কবির ছাত্রী রেণু (বসু) ভৌমিক-এর—এটিও আমি ঐ ১৯৭৫ কবিভবনেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। রেণু ভৌমিক প্রায়ই, মানে প্রতি বছরই কবির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোলকাতা থেকে এখানে (ঢাকায়) আসতেন—এটা সেই সময় গ্রহণ করা। অপরটি জনাব মোফাজ্জল হোসেন, 'সওগাত' এবং 'মোহাম্মদী'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে আমাকে জানিয়েছিলেন, ১লা জুন ১৯৭৫-এ এসেও ছিলেন কবিভবনে, তখন তিনি আমার কাছে যা বলেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছিলাম। আমার ভালো লেগেছিল। আশা করব এই 'তিনটি লেখা' আপনাদের নতুন কিছু তথ্য দিতে সাহায্যও করতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার বয়স তখন কত যখন এ বাড়িতে এলেন?

কুশা : ১৪ বছরের মত।

প্রশ্ন : আপনার নাম কি?

কুশা : কিশোর সালু কুশা।

প্রশ্ন : কি করে কবির সাথে যোগাযোগ হল?

কু : দাদুর পালক কন্যা শ্রীমতি শান্তি সেন যখন স্কুলে যাতায়াত করে তখন আমি আমাদের 'রকে' বসে থাকি। তখন ঐ মুদি দোকানে খোঁজ রেখে যায় যে তাদের একজন বাচ্চা ছেলে দরকার কাজের লোক হিসেবে। প্রতিদিনই খোঁজ করে যায়। এমনি করে হঠাৎ একদিন শান্তি সেনের বাড়ির কাজের লোক চলে যাওয়াতে আবার ডেকে নিল।

www.pathagar.com

প্র: আপনার বাড়ি কোথায়?

ক: উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলাতে।

প্র: কোলকাতায় কেন এলেন ওখান থেকে?

ক: নিজের বাড়িতে আমি ছিলাম না। মামাদের বাড়িতে ছিলুম। সেখান থেকে কাজের জন্যে কোলকাতা এসেছিলুম।

প্র: যখন আপনি কবি বাড়িতে এলেন তখন কবিকে কি অবস্থায় পেলেন?

ক: কবির তখন ঝাঁকড়া চুল, ভাল অবস্থায় ছিলেন। ঘুম থেকে ৯।১০ টায় উঠতেন। চা এবং পান খেতেন। ২।১টা পরোটা রসগোল্লা-সন্দেশ—এগুলো দিয়ে নাশতা করতেন।

প্র: কবি তখন নির্দিষ্ট সময়ই কি ঘরে ফিরতেন?

ক: ঠিক নির্ধারিত সময় ছিল না।

প্র: দুপুরের খাওয়া কোথায় করতেন?

ক: কোনদিন অফিসে, কোনদিন বাড়িতে এবং বিকেলে শুধু চা খেতেন।

প্র: কোন্ কোন্ শিল্পী বাড়িতে আসতেন?

ক: শিল্পীরা কোনদিন বাড়িতে আসতেন না। গ্রামোফোনের অফিস ছিল, সেখানে কবির সঙ্গে ওদের আলাপ হত।

প্র: আপনি কবির কাছে আসার কতদিন পর কবির এ অবস্থা হল?

ক: প্রায় ১০ বছর।

প্র: বুলবুলকে তো পাননি আপনি?

ক: না।

প্র: কবির ক'ছেলে ছিল?

ক: তিন ছেলে।

প্র: কবির যখন এ অবস্থা হল, তখন সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধর বয়স কত?

ক: চৌদ্দ পনরো হবে।

প্র: কবিকে কোনদিন সিগ্রেট বা মদ খেতে দেখেছেন?

ক: না। তবে কাশী থেকে আমদানী করা রূপালী জর্দাসহ পান এবং চা খেতেন।

প্র: স্নো পাউডার ব্যবহার করতেন কি?

ক: হ্যাঁ। হ্যাজলিন স্নো! কোটি পাউডার, চন্দন সাবান, লাক্স, জবা-কুসুম, বনকুসুম, ক্যাস্টার অয়েল ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।

প্র: কোন্ রঙের জামা পরতে ভালবাসতেন?

ক: গেরুয়া। গরদের গেরুয়া পাঞ্জাবী, গেরুয়া চাদর, গেরুয়া টুপী, সবুজ রঙের কিম্বা সাদা রঙের নীল মিশানো সস্তাদরের স্যাণ্ডেল পরতেন।

www.pathagar.com

প্র: কবির প্রিয় মাংস কি ছিল? প্রিয় মাছ কি ছিল?
ক: খাসী, মুরগী ইত্যাদি। ইলিশ এবং রুই। ইলিশ খুব প্রিয় ছিল।
প্র: কবির যখন এ অবস্থা দেখা দিল তখন কবি কি করতেন?
ক: প্রথমে একটু জ্বর হয়ে এ অবস্থা হল। তারপর আবোল তাবোল বকতেন। তারপর মারধর করতেন। আমাদের রুমে যেতে দিতেন না।
প্র: শোনা যায় তার গায়ে এ অবস্থায় শিকল দেয়া হয়েছিল? এটা কি সত্য?
ক: না। তখন ঘরে চাবি দিয়ে রাখা হত।
প্র: ছেলেরা কাছে যেত কি?
ক: কাছে গেলেও মারধর করত বলে ঘরে যেতনা।
প্র: প্রমীলা নজরুল তখন কোথায় থাকতেন?
ক: ঐ ঘরেই। প্যারালাইসিস অবস্থায় ছিলেন। কোমরে তখন তাঁর একটা বড় ঘা ছিল, পরে ওটা পচে বেরিয়ে গেছিল।
প্র: স্ত্রীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন?
ক: একই রকম। আমরা যেমন কবিকে এখন খাইয়ে দিই, তেমনি প্রমীলাও তখন কবিকে খাইয়ে দিতেন। কবির এ অবস্থায় প্রথম থেকেই নিজে খেতে পারতেন না। মাঝে মাঝে শাশুড়ীও খাইয়ে দিতেন। এ অবস্থায় কবি এবং স্ত্রী ভিন্ন কামরায় থাকতেন।
প্র: কবির এ অবস্থার কতদিন আগে প্রমীলার এ অবস্থা হয়েছিল?
ক: ৫/৬ বছর।
প্র: কবির শাশুড়ীদের পক্ষের কেউ কবির এ অবস্থায় কাছে আসত কি?
ক: না। কেউ টাকা পয়সা দিত না। ২/৩ বৎসর পর্যন্ত যা ঘরে ছিল তা-ই দিয়ে চলত। পরে সরকার থেকে ব্যবস্থা হয়েছিল।
প্র: নিজের ছেলেদের গান বাজনা শেখাতেন কি?
ক: কবি শেখান নি। কমলদাস গুপ্তর কাছে গিয়ে শিখত ছেলেরা। বাড়িতে একটা হারমোনিয়ম ছিল। পড়েই থাকত।
প্র: চুল উঠতে আরম্ভ হল কেন?
ক: ভাল অবস্থাতেই চুল উঠতে শুরু করেছিল।
প্র: চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়েছিল কি?
ক: হয়েছিল। ডাঃ ব্রহ্মচারী ছিলেন কবির নিজস্ব ডাক্তার এবং পরিবারের। উনি মারা গেলেন হঠাৎ। তাই তখন কবিকে মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কবি হাসপাতালের নিয়ম মানতেন না বলে কর্তৃপক্ষ কবিকে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

প্র: কবির কথাবার্তা কখন থেকে বন্ধ হ'ল?

ক: অসুস্থ হবার প্রায় বছর খানেক পর থেকে ধীরে ধীরে।

প্র: কবির লেখা পত্রগুলো কোথায় থাকত?

ক: একটা স্যুটকেস জাতীয় ব্যাগ ছিল। সেটা নিয়েই কবি বেড়াতেন এবং ওর মধ্যেই সমস্ত লেখাপত্র থাকত।

প্র: কবির ব্যবহার কিরূপ ছিল?

ক: এমন ভাল ব্যবহার আমি কখনো দেখিনি।

প্র: কবির প্রথম যখন রোগ ধরা পড়ে তখন কোন্ বাড়িতে ছিলেন?

ক: হরিঘোষ স্ট্রিটের বাড়ীতে। বাড়ীটা কর্পোরেশনের ছিল। ধীরেন সেন বাবু নামক হরিয়াপুকুর স্ট্রিটের এক ভদ্রলোক ৬০।৭০ টাকা করে ভাড়া নিতেন। প্রথম ৭০ টাকা ভাড়া ছিল পরে ৬০ টাকা। ধীরেন দাস সে পাড়াতে ছিলেন। তিনি এই বাড়ী করে দিয়েছিলেন। ৮।১০ বছর তিনি এ বাড়ীতে ছিলেন। এর পরে ভবানীপুর, তারপর শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। এরপর মানিকতলা। মানিকতলা থেকেই চিকিৎসার জন্যে লণ্ডন গিয়েছিলেন। ফিরে এসে পাইকপাড়ায় ছোট ছেলের কাছে উঠলেন। বড় ছেলে থাকত পদ্মপুকুরে।

প্র: বড় ছেলে কোন বাড়ীতে থেকে বিয়ে করে?

ক: মানিকতলায় থেকে। ঘরোয়া বিয়ে ১৯।২০ বছর আগে।

প্র: ছোট ছেলের?

ক: মানিকতলাতে। ঘরোয়া বিয়ে। বড় জনার আগে।

প্র: উমা কাজীর সাথে কি করে দেখা?

ক: জ্যোতি বলে একজন রেডিওতে কাজ করত। সব্যসাচীর সঙ্গে আলাপ ছিল তার। সে উমাকাজীর সঙ্গে আলাপ করান। তারপর বিয়ে। বিয়ের আগে উমাকাজীকে তার ভাই এসে দিয়ে গিয়েছিল সব্যসাচীর কাছে।

প্র: কবির কোন ফোন ছিল নাকি?

ক: না।

প্র: রেডিও ছিল?

ক: হ্যা। রেডিও ও গ্রামোফোন ছিল। আলমারীর মত বড় গ্রামোফোন ছিল, ছোটও একটা ছিল। রেডিও শুনতে সময় পেতেন না।

প্র: ঘুমাতেন কোথায়?

ক: খাটে কিম্বা নীচে।

www.pathagar.com

প্র: স্বরলিপি বা সুর কোথায় করতেন?

ক: আপিসে। বাড়ীতে কিছুই করতেন না। তবে শিল্পীরা কোন সময় এসে পড়লে করতেন।

প্র: ধুতি বা লুঙ্গী কোনটা পরতেন?

ক: ধুতি। কোনদিন লুঙ্গীর মত করে ধুতি পরতেন। আগে চোস্ত পায়জামাও পরতেন।

প্র: খেলাধুলা করতেন কি?

ক: দাবা খেলতেন। তাস খেলতেন। বন্ধু বান্ধবদের সাথে এবং মেয়েদের সাথেও।

প্র: কবি কি হঠাৎ করে কোথাও চলে যেতেন?

ক: না। দুতিন মাসের জন্য যেতেন এমন দেখিনি।

প্র: নামায পড়তে দেখেছেন কি?

ক: দেখিনি তবে শুনেছি।

প্র: ধ্যানে বসতেন কি?

ক: হ্যা। ছাদের উপরে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ১১।১২ টার দিকে। বলতেন ছাদের উপর বালিশ বিছানা দিয়ে আয়—সেখানে ঘুমোবো।

প্র: কবির অসুখ হওয়ার পরে চঞ্চলতা কখন শান্ত হয়ে উঠল?

ক: রোগ হওয়ার পর কবি মাঝে মধ্যে বলতেন ঔষধ খাবনা। আমার কিছুই হয়নি।

প্র: কবির রোগ দেখা দেয়ার পর আপনি কি চলে গিয়েছিলেন?

ক: ছয় মাসে ত্রিশ টাকা দেয়ার পর শাশুড়ী আমায় চলে যেতে বল্লেন। চলে গিয়েছিলাম। একমাস পরে আবার নিজের টানেই চলে আসলাম। সেই থেকে আজো আছি।

প্র: প্রমীলা দেবীর ব্যবহার কেমন ছিল কবির প্রতি?

ক: ভাল। এবং কবিকে দেখেছি পাশে গিয়ে বসতেন। কখনো হাসতেন কখনো চুপ করে থাকতেন—এই এখন যেমন ঠিক তেমনি করতেন।

প্র: প্রমীলার মৃত্যুর সময় কবি কিরকম করছিলেন?

ক: কবর দেয়ার সময় আমি বড় ছেলের মানে সব্যসাচীর বাড়িতে ছিলাম। প্রমীলা মারা যান অনিরুদ্ধর বাড়ীতে। মৃতের সাথে কবিও চুরুলিয়াতে যান। আমি রাতে বড় বাবুর বাড়ী থেকে হেঁটে হেঁটে যখন ছোট বাবুর বাড়ীতে যাই তখন গিয়ে দেখি ছোট বাবুর শাশুড়ী ছাড়া কেউ নেই। কবি সমেত সবাই চুরুলিয়াতে গেছে। আমি আর চুরুলিয়াতে যাই নি। তাই সে সময়ের কথা খুব একটা বলতে পারব না।

www.pathagar.com

প্র: কবির বড় নাতি-নাতনীরা দাদী মারা যাওয়ায় বুঝতে পেরেছিল কি?

কু: না। ও সময় ওরা ছোট ছিল, ৪/৫ বছর হবে।

প্র: প্রমীলা কোথায় মারা যান?

কু: পাইকপাড়ার বাড়ীতে। তিন তলায়। মৃত্যুর সময় কবি কিছুই বুঝতে পারেন নি। চুরুলিয়া থেকে ফিরে এসেও কবি পাইকপাড়ায় ছোট ছেলের কাছে ওঠেন।

প্র: বড় ছেলের কাছে কবি কখন থাকেন?

কু: প্রমীলা মারা যাওয়ার মাস দু'য়েক পর। কাঠিয়া (কুশার মত অন্য একজন) সে সময় বড় বাবুর কাছে কবির সাথে আসে।

প্র: আপনার এখন বয়স কত?

কু: প্রায় পঞ্চান্ন। কবির কাছে প্রায় ৪২ বছর।

প্র: কবি ভাল অবস্থায় আপনার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন?

কু: ভাল। খুব ভাল। কুশা বলে ডাকতেন। পরোটা বানিয়ে দিতাম। দু'টো ডাবর বোম্বাই পান বানিয়ে দিতাম। চা দিতাম। তবে মাঝে মধ্যে শাশুড়ী বা পালক কন্যাও বানিয়ে দিত। একটা বাক্স ছিল সেটার থেকে তাঁর জামা কাপড় সমস্ত বের করে গুছিয়ে দিতাম।

প্র: কবির সাথে বিদেশে কবির দু'পুত্রই গিয়েছিল কি?

কু: না। ছোট ছেলে অনিরুদ্ধ গিয়েছিল।

প্র: আর কতদিন কবির সাথে থাকবেন?

কু: এতদিন যখন রইলাম, বাকী জীবনটাও বাবুর সাথে কাটিয়ে দিলে দোষ কি? (উল্লেখ্য—বাকী জীবনটাও কুশা কাটিয়ে দিয়েছেন কবির পাশে—কুশাদা কবি মারা যাওয়ার বছর দুই পর মারা যান। নিম্নের সাক্ষাৎকার সে সময় পত্রিকায় দেয়া যায়নি—পরে নেয়া হয়েছিল এইটুকু—)

প্র: কবিকে সাইকেলে চড়তে দেখেছেন কি?

কু: না।

প্র: আপনি যখন ছিলেন তখন কবির কোন গাড়ী ছিল কি?

কু: হ্যাঁ। একটা টিকরঙ্গা লালচে ধরনের গাড়ী ছিল। ৮০০০ (আট হাজার) টাকা দিয়ে কিনেছিলেন নগদ। আর মোট ১২০০০ টাকার বাকী ইনসটলমেণ্ট হিসেবে শোধ দিতে না পারায় এবং দেনায় পড়ায় এক ইংরেজ কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেন। এরপর আবার এক বছর পর আর একটা গাড়ী কিনেছিলেন সবুজ রঙ্গের। তা-ও টেকেনি। নিজের গাড়ী করে কবি হাজারিবাগ এবং রাঁচীও গিয়েছিলেন। সীতানাথ রোডের এক

www.pathagar.com

বাড়িতে তখন ছিলেন। এ সময় আমি ছিলাম না। তবে এরপর বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে যখন ছিলেন তখন আমি ছিলুম, এ বাড়ী থেকেই বাবু হাজারীবাগ–রাঁচী যান। এবং আমি আসার আগেও বেবী অস্টিন নামে একটা ছোট্ট গাড়ী ছিল। তিন নম্বর গাড়ীটা ৩।৪ বছর ছিল। তবে পূর্বের দাম না দেয়াতে যার গাড়ী সে নিয়ে গিয়েছিল কবির এ অবস্থার কিছু আগে।

প্র: কবি ড্রাইভ জানতেন কি?

কু: না। নেপালী ও হিন্দুস্থানের ড্রাইভার ছিল বিভিন্ন সময়।

প্র: প্রমীলার অসুস্থাবস্থায় কবির তরফ থেকে কি কি এবং কোন জাতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল?

কু: কবিরাজী চিকিৎসাই করেছিলেন প্রথম বিভিন্ন কবিরাজকে দিয়ে। তারা নানান পদ্ম-শাপলা ইত্যাদি দিয়ে ঔষধ করত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পরে পাড়ার আর একজন কবিরাজকে দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তবুও কিছু না হওয়াতে বৈজ্ঞানিক মানে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয়।

প্র: প্রমীলা দেখতে কেমন ছিলেন?

কু: সুন্দরী ছিলেন।

প্র: কবি কি খুব সৌখিন জীবন যাপন করতেন?

কু: না। একদম সাদাসিধে।

প্র: কবিকে রাগ করতে দেখেছেন কি?

কু: ছেলেপিলেদের উপর রাগ করতেন। আমাদের ওপরও। তবে মারতেন না।

প্র: কবি নিজে শেভ করতেন কি?

কু: নিজেই করতেন শেভ। চুল কাটতেন নাপিত বাড়িতে ডেকে এনে।

প্র: কবি কি নিজে বাজার করতেন?

কু: না। আমি বা অন্যে।

প্র: কবির শাশুড়ী শোনা যায় চলে গিয়েছিলেন, কোথায় এবং কেন?

কু: শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া হত না। দেখিনি ঝগড়া হতে। বাবুর (কবির) যখন এ অবস্থা তার বেশ কবছর পর শাশুড়ী চলে যায়। তবে কোথায় যায় বলতে পারব না সঠিক, কারণ, তার চলে যাওয়ার সময় আমি দেশে গিয়েছিলাম।

প্র: কবিকে আপনি কি বলে সম্বোধন করতেন?

কু: বাবু বলেই সম্বোধন করতাম।

প্র: কবি স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরতেন না হাতওয়ালা?

কু: হাতওয়ালা 'ভি' শেপ গলা।

www.pathagar.com

প্র: কোন্ ফল সবচাইতে ভালবাসতেন?
কু: ন্যাড়া (ল্যাংড়া) আম।
প্র: কবির কোন ক্যামেরা ছিল কি?
কু: ক্যামেরা ছিল তবে নিজে ছবি তুলতেন না।

কবির ছাত্রী শিল্পী রেণু (বসু) ভৌমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন: কবির সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাতের সময় বয়স কত ছিল?
রেণু: চৌদ্দ।
প্রশ্ন: কিভাবে সাক্ষাত হল?
রেণু: ছোটবেলা থেকেই গান করি। যখন আমার বয়স চৌদ্দ তখন এইচ. এম. ভিতে গান করার সুযোগ পাই। প্রথম গান চণ্ডীদাসের কীর্তন—তুলসী লাহিড়ীর সুর। প্রায়ই দাদার সাথে স্টুডিওতে যেতাম। এমনি একদিন স্টুডিওতে গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রী হেম সোম এসে বল্লেন এবার কাজী নজরুলকে দিয়ে রেণুর গানের ট্রেনিং দেব। তারপর একদিন দাদার সাথে স্টুডিওতে এলাম সেখানে কাজীদার সঙ্গে সাক্ষাত হল। এখানে বসেই কাজীদার সঙ্গে কথাবার্তা হল যে হেম সোমের বাড়ীতে বসেই আমার রেকর্ডের গান শেখানো হবে। সে মতে একবার হেম সোমের বাড়ীতেই যাই। কাজীদা আমায় ১০।১২ খানা গান শোনান। এবং বল্লেন, এর থেকে তুমি যে গানটি পছন্দ করবে সেটি শেখ। প্রথম আমি 'দ্বার খুলে আর রাখব না' গানটি পছন্দ করলাম। এবং ৭/৮ দিন Instrument Rehearsal এর পর গানটি রেকর্ড করা হয়।
প্র: কবির কয়টি গান আপনি রেকর্ড করেছেন এবং সবকটি গানই কি তাঁর থেকেই তুলেছেন?
রে: পনরটি গান। ১। দ্বার খুলে আর রাখব না ২। মধুকর মঞ্জীর বাজে ৩। তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী ৪। তুমি আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি ৫। একি অপরূপ রূপের কুমার হেরিলাম সখি যমুনা তীরে ৬। এস মা দশভুজা ৭। ভুবনময়ী ভবনে এসো ৮। শ্যামসুন্দর মম মন্দীরমে আও ৯। জগজনমোহন সংকটহারী কৃষ্ণমুরারী শ্রীকৃষ্ণমুরারী ১০। দোলে বনতমালের ঝুলনাতে কিশোরী কিশোর ১১। মম বন ভবনে ঝুলন দোলনা দে দোলায়ে ১২। চৈতী চাঁদের আলো আজ ভাল নাহি লাগে ১৩। সে দিন বলেছিলে এই সে ফুলবনে ১৪। আঘাত দিয়ে মন ফেরাবে ১৫। দাসী হতে চাইনা আমি হে প্রিয় হে বল্লভ। হ্যা—

www.pathagar.com

একমাত্র চৈতী চাঁদের আলো এবং সেদিন বলেছিলে এই দু'টো গান শৈলেশ দত্ত গুপ্তর থেকে তুলেছি—এরই সুরকরা দু'টো গান।

প্র: আপনার বাড়ীতে কি এ পর্যায়ে কাজীদা কখনো যেতেন?

রে: হ্যাঁ। কাজীদা আমার বাড়িতে এসেছেন গান শেখাতে। আমার মা-বাবা-দাদারা-বৌদীরা—বোনেরা সবাই কাজীভক্ত। উনি যখন আসতেন তখন আমি পান সাজিয়ে রাখতাম—পান খেতে ভালবাসতেন খুব। আমায় বলতেন তুমি এত রোগা কেন? খাওনা নাকি? Length without breath? কাজীদাকে দেখতাম আমার ছোট বোন আরতীকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। হৈ হল্লা খুব করতেন—গল্পও খুব বলতেন। বলতেন তবিয়ত দিয়ে গাও। খুব স্নেহ করতেন। আমায় বলতেন এবং নিজেই আমার দাদা এবং আমাকে গাড়ী করে বাড়ি পৌঁছে দিতেন।

প্র: সে সময় কাজীদার কি নিজের গাড়ী ছিল?

রে: হ্যাঁ। গাড়ীটা খুব সুন্দর গদিটদি আঁটা ছিল। সনটা ১৯৩৫–৩৮ এবং এই চার বছরই আমি ওনার touch–এ ছিলাম এবং '৩৮ সনে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং স্বামীর সাথে হায়দ্রাবাদ চলে যাই। এরপর আমি আর কাজীদাকে সুস্থ দেখিনি। ১৯৪২ সনে কোলকাতায় আবার এলাম এবং কাজীদাকে অসুস্থ দেখলাম। পত্রিকান্তরে ওঁর এবং ওঁর স্ত্রীর অসুস্থতার খবর অবশ্য পেয়েছিলাম।

প্র: বুলবুল সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোন গল্প করতেন কি?

রে: না। আমিও জিজ্ঞেস করিনি।

প্র: কবি স্ত্রী প্রমীলার সঙ্গে আলাপ ছিল?

রে: খুব ভাব ছিল। খুব সুন্দরী ছিলেন। ওঁর মা গিরিবালা দেবীকেও দেখেছি—সদালাপী ছিলেন, ফর্সা—সুন্দরী লম্বা ছিলেন। প্রমীলাও খুব সদালাপী ছিলেন। একদিনও না খাইয়ে ছাড়েন নি। দেখতাম যখন অসুস্থ ১৯৪২ কবিকে শুয়ে শুয়ে খাইয়ে দিতেন। ছোট্ট খাটে কাত হয়ে তরকারী কাটতে দেখতাম। পান সাজাতেন। টেলিফোন ওনার পাশেই থাকত। তাতে যোগাযোগ করে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাতেন। অনিরুদ্ধ–সব্যসাচীর বিয়ে হয়ে যাবার পরও সংসার ওনার ওপরই ছিল।

প্র: বেতারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কবে থেকে?

রে: ১৯৩৫-এ। আমার রেডিওতে প্রোগ্রামের আগেই কাজীদার রেকর্ড বেরিয়েছে আমার কণ্ঠে। বিয়ের পরে আমার গান বাজনার কিছুটা লাঘব ঘটে। শ্বশুর মশাইদের তরফ গান বাজনায় খুব আগ্রহী ছিলেন না। সেকালে

www.pathagar.com

বাড়ীর ছোট বৌ, জোর করে কিছু একটা করতাম না। তবুও গান যাতে হয় সে চেষ্টা ছিল এবং তাই আজো করে যাচ্ছি। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাবার পর আবারও গান করছি।

প্র: কবির কাছে আপনি যখন গান শিখতেন তখন অন্য কোন শিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল কি?

রে: কমলদাস গুপ্ত, নিতাই ঘটক, সুবলদাস গুপ্ত প্রমুখ। এই পর্যায়ে একদিন এক গাড়ীতে আমরা দমদম স্টুডিওতে গান রেকর্ডের জন্য যাই তখন সে গাড়ীতে আব্বাসউদ্দীন আহমেদও ছিলেন। গিরীন চক্রবর্তীও ছিলেন ঐ গাড়ীতে। যুথিকা রায়, আশালতা রায়, গীতা বসু, নমিতা দত্তের সঙ্গে পরিচয় ছিল সে সময়।

প্র: আপনার সামনে কবিকে আর কাউকে গান শেখাতে দেখেছেন?

রে: আশালতা রায়, হরিমতী, কমলা ঝরিয়া—এদের দেখেছি আমার সামনে কাজীদাকে গান শেখাতে। 'হায় ভিখারী কাহার কাছে হাত পাতিসনে হায়' এবং অপর পিঠে 'সন্ধ্যা হল ওগো রাখাল এবার ডাক মোরে' শিখিয়েছিলেন আমার সামনে আশাদীকে।

প্র: কবি কি কখনো গানের কথা বদল করতেন?

রে: হ্যাঁ। 'দাসী হতে চাইনা আমি' গানটির দাসীর বদলে 'রাণী' করেছিলেন। আমার দাদা বললেন কাজীদাকে যে, দাসী কথাটা শুনতে ভাল লাগছে না। সঙ্গে সঙ্গে কেটে 'রাণী' করে দিলেন।

প্র: আপনার সামনে কবি কোন গান রচনা করেছিলেন?

রে: হ্যা। একটু সময় পেলেই কবি গান রচনা শুরু করতেন এবং সুরও সঙ্গে সঙ্গে দিতেন।

প্র: কবির ব্যবহার সবার প্রতি কিরূপ ছিল?

রে: ব্যবহার এবং মন খুব উদার ছিল। নিরহংকারী ছিলেন। কারো মধ্যে একটু সম্ভাবনা থাকলেই উনি তাকে কিছু সুযোগ করে দিতেন। যেমন 'তুমি যে বলিয়াছিলে' এ গানটির রচয়িতা ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ মিত্র। উনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন গানটি আপনার (কবির) গানের (দ্বার খুলে আর রাখব না) উল্টো পিঠে হোক। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

প্র: কবির জন্মদিনে কেন ছুটে আসেন ঢাকায়?

রে: কোলকাতায় ওঁর জন্মদিনে আমরা প্রত্যেক বছরই যেতাম। এখন উনি ওখানে নেই সে অভাব আমরা বোধ করি এবং সেজন্যই ঢাকায় ছুটে

www.pathagar.com

আসি। ওঁকে গান শোনাই এবং নিজেকে ধন্য মনে করি। এসে ওঁনার এ অবস্থা দেখে কষ্ট হয়। চারিদিকে সাজ সাজ রব, কত লোক আসছে—ফুল দিচ্ছে—মালা দিচ্ছে—কিন্তু কবি নির্বাক।

প্র: কবিকে বাংলাদেশে এখন কেমন দেখছেন?

রে: বাংলাদেশেই আমি ভাল দেখেছি। চারদিকে গাছপালা, এত বড় বাড়ী, এত সুন্দর ব্যবস্থা, এতসব মিলিয়ে কবি খুব ভাল আছেন। মাঝে মাঝে খুব হাসতেও দেখি এবং সজিব মনে হয়, যেটা ওখানে মনে হত না বা ছিল না।

প্র: ঢাকাতে নজরুলগীতি শিল্পীদের বিশেষ করে নতুনদের সম্ভাবনাময় মনে হয় কি?

রে: হঁ্যা। ঢাকাতে নতুনরা যারা কবির গান করে তারা গান বাজনা শিখেই নিষ্ঠার সঙ্গে করে যায়। প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে ওদের মধ্যে এবং আমার খুবই ভাল লাগে।

প্র: আপনি কি কাজীদা ছাড়া আর কারো গান রেকর্ড করেছেন বা ট্রেনিং নিয়েছেন?

রে: হঁ্যা। কাজীদার গান ছাড়া আমি কমলদাশগুপ্ত, সুবলদাশগুপ্ত, অনিল ভট্টাচার্য, নিতাই ঘটক, শৈলেন দত্তগুপ্ত, মহম্মদ খোদাবক্স (পাঞ্জাবের ছিলেন), চিত্ত রায় এবং কবি জসীমউদ্দিনের ট্রেনিং-এ গানের রেকর্ড করেছি। সবসমেত পঁচিশটার মত রেকর্ড মানে পঞ্চাশখানা গান রেকর্ড ছিল।

প্র: আরো গান গেয়ে যেতে চান?

রে: হঁ্যা। যতদিন ভগবান শক্তি দেবে ততদিনই গেয়ে যাব।

প্র: ঢাকাতে রেডিও-টিভিতে গান করেছেন?

রে: হঁ্যা। গতবার করেছি রেডিওতে। তার আগেরবারে টিভি এবং রেডিওতে করেছি। এবারও করার আশা রাখি

প্র: ঢাকাতে এসে বাংলাদেশের অন্য কোথাও গেছেন কি?

রে: হঁ্যা। চিটাগাং, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুরে গিয়েছি এবং গান করেছি। ঢাকাতে কবির সঙ্গে ফরাশগঞ্জ (লালকুঠি), বাংলা একাডেমী, ইউনিভার্সিটি, নজরুল একাডেমীতে গান করেছি। ছায়ানটেও করেছি।

প্র: রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে থাকেন কি। শান্তিনিকেতনের সাথে যোগাযোগ আছে কি?

রে: হঁ্যা। এবং ভক্ত। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কোলকাতার সঙ্গে যুক্ত। এদের সঙ্গে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গান গেয়ে থাকি। এদের সাথে বোম্বে, দিল্লী, আহমেদাবাদ গিয়েছি।

www.pathagar.com

প্র: কবির রেকর্ডের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা এবং কবির জনপ্রিয়তা সে সময় কিরূপ ছিল?

রে: কবি নজরুলের চাহিদা অতুলনীয়। আমার একটা রেকর্ডের বিক্রির সংখ্যা দেখলেই অনুমিত হতে পারে। আমার 'দ্বার খুলে আর রাখব না' গানটি বিশ হাজার কপির উর্ধ্বে বিক্রি হয়। যে কোন রেকর্ড সেটা কাজীর হলেই হল—বাজার দখল। আমার জীবনে এখনো পর্যন্ত এমনটি হতে দেখিনি। শুধু তাঁর গানের চাহিদাই সবচাইতে বেশী ছিল তাই নয় কবি হিসেবেও তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁর সময় সবচাইতে বেশী ছিল। যেখানেই কাজীদা আছেন সেখানেই জীবন আছে বলে মনে হত। আর কাজীর গজল গান হলে তো কথাই নেই। সত্যি কবি অতুলনীয়।

বি: দ্র: এই সাক্ষাৎকারটি ৫ই জুন ১৯৭৫-এ কবিভবনে গ্রহণ করেছিলাম।

মোকাজ্জাল হোসেন সাহেবের বর্ণনা

১৯২৭ সাল। কৃষ্ণনগর। সপ্তম শ্রেণী (তৃতীয় শ্রেণী) কলেজিয়েট স্কুলে পড়াতম। একদিন বিকেলে হাফপ্যাণ্ট গেঞ্জি পরে দৌড়াচ্ছি—এমনি সময় ডাগর চোখে ঝাঁকড়া চুলে হোস্টেলে উঠছেন—সাদা ফতুয়া, সাদা লুঙ্গী, ছেড়া চপ্পল পায়ে—বলিষ্ঠ দেহ, ডাকাত ডাকাত চেহারা। দেখে একটু ভয় পেলাম। সস্নেহে কাছে এগুলেন, বললেন ভয় নেই। প্রশ্ন করলেন—হোস্টেলের সুপার কোথায়? —বাসায়। বললেন—একটুকরো কাগজ হবে? সাথে সাথে আমার রুমে এসে এক টুকরো কাগজ নিয়ে দিলাম। লিখলেন এবং 'সুপারকে দেবে' বলে চলে গেলেন। সন্ধ্যেয় সুপারকে ওটা দেবার সময় বললাম—স্যার, এক ডাকাত এসে আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেল। আগ্রহ ভরে সুপার পত্রটা পড়েই বললেন--বসতে দিয়েছিলে?--না। তিনি বল্লেন--এযে তোমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অবাক হয়ে বললাম--ডাকাত হলে কি তবে কবি হয়। ধমকে বললেন--ও কথা বলতে নেই, তোমাকে কবির বাসায় নিয়ে যাব। এবং পরদিন কবির বাসায় সুপারের সাথে গেলাম। কবি বেতের চেয়ারে বসে কিছু লিখছেন। আমায় দেখে কাছে টেনে নিলেন এবং সুপারকে বসতে বলে আমায় ভিতরে নিয়ে গেলেন। (সুপারের নাম মুহম্মদ ইউসুফ আলী)। ভিতরে যেতে দেখলাম খুব সুন্দরী, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, মাথায় সিঁদুর এক মহিলা এসে আমায় বললেন—তোমার নাম কি? বললাম নাম। বসতে বলে এক প্লেট নাস্তা (রসগোল্লা নিমকি) নিয়ে এলেন। খেলাম। কবি বাইরে চলে গেলেন। ঘরের চারদিকে আমি ভাল করে

www.pathagar.com

দেখলাম মামুলী কিছু আসবাবপত্র, ময়লা কাপড়-চোপড় এবং তাকের উপর হিন্দুদের সমস্ত দেবদেবী। এরই মধ্যে কবি ফিরে এলেন। বললেন—পান দিয়েছ তো? কবিপত্নী বললেন—তোমার বুদ্ধি হবে কবে? তোমার পান দরকার তা-ই বলনা—বলেই ওনাকে পান দিলেন আর আমায় ধনে ভাজা দিলেন। নমস্কারান্তে উঠলাম। কবিপত্নী বললেন—আবার এসো। বাইরে এসে কবিকে সালাম করে চলে এলাম। পথে এসে সুপারকে বললাম এটা কি দেখলাম—বাড়ীর ভেতর দেখলাম হিন্দু বৌ এবং দেব-দেবী আর কবি মুসলমান? সুপার বললেন—ছি: ওকথা বলতে নেই। কবিরা সব জাতিতেই বিয়ে করে। হোস্টেলে ফিরে তাঁর কবিতা খুঁজে বের করলাম এবং আবৃত্তি করতে লাগলাম। দিন গড়িয়ে গেল। মাঝে মাঝে কবিকে দেখে আসি। ১৯৩১। (এ চারবছর কবি কৃষ্ণনগরের ঐ বাড়ীতেই ছিলেন—ঘর একটা, রান্নাঘর সংলগ্ন, টিউবওয়েল, পুরোনো বাড়ী, বিরাট আম বাগান, আস্তাবল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ের কোন সাহেবের দালান বাড়ী) চাঁদ সড়ক যায়গার নাম।

নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর। নেতাজী সুভাষ ও কবি এলেন কংগ্রেসের এক সভা করতে। লোকে লোকারণ্য। মিউনিসিপ্যাল পার্কে এই সভা হয়। ছাত্ররা স্বেচ্ছা-সেবক হয়ে সভাতে গেলাম। ১৯৩১। কংগ্রেসে যখন মতিলাল নেহরু বলেছিলেন ছাত্ররা এবার স্কুল কলেজ ছাড়—অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দাও। সভা আরম্ভ হল। গর্জে উঠল কবি কণ্ঠ 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'। নেতাজী ভাষণে বললেন Give me blood I will give you freedom. চারিদিকে এক নতুন স্পন্দন উত্তেজনা জেগে উঠল। সভা ভাঙ্গল। বিলিতি মদের দোকান—কাপড়ের দোকান প্রথমে Picketing তারপর আগুন ধরিয়ে দিলাম। শ্রী গুণময় চ্যাটার্জী মেহেরপুর এস. ডি. ও. আমাদের ১৭ জনকে গ্রেফতার করল (পুলিশ ইতিমধ্যে কিছু লাঠিচার্জ করার ফলে আমার কপালে আঘাত লাগে যেটা এখনো দেখা যায়)। নয়দিন হাজতে ছিলাম। এর রেজাল্ট হল এই যে, আমার বাবা তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর, না পাই ঘরে না পাই বাইরে স্থান। আমার বাবা এবং অন্যান্য গার্জিয়ানরা এসে এসডিওর সঙ্গে আলাপ করে একটা ফয়সালা করে ছাড়িয়ে নিলেন আমাদেরকে। আমরা গুমরে দিন কাটাচ্ছি।

১৯৩৩। কোলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন পড়ি, কোলকাতায় টেলার হোস্টেল একমাত্র গরীব মুসলমানদের ছাত্রাবাস—সেটা উঠিয়ে দেবার জন্য কাউন্সিলে এক বিল পাস হবে এমতাবস্থায় এ. কে. ফজলুল হক সাহেব-এর কাছে আমরা যাই। তিনি বললেন তোমরা একতাবদ্ধ হও এবং আমাদের কথামত

www.pathagar.com

কাজ করতে রাজী কিনা জানাও। স্বীকার হলাম এবং এ্যালবার্ট হলে এক বিরাট ছাত্র সভার আয়োজন হল। কবি নজরুল সেখানে গান গাইলেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার', 'চল চল্‌ চল্‌ ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল' এবং 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল করে লোপাট'। সিদ্ধান্ত হল প্রত্যেক এম. এল. সি.র বাড়িতে গিয়ে বলব টেলার হোস্টেল এ্যাবোলিশ করার জন্য কাউন্সিলে আপনারা জোর প্রতিবাদ জানাবেন—কথা দিতে হবে। তারপরে ওরা (এম. এল. সি) প্রতিবাদ জানায় এবং টেলার হোস্টেল থেকে যায়।

১৯৩৬। কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে এক All Bengal Muslim Students Association Conference হয়। সেখানে কবিকে আনবার জন্য আমরা কোলকাতা গিয়েছিলাম, কিন্তু কবি গ্রামোফোন কোম্পানীর সাথে এত জড়িত এবং ব্যস্ত ছিলেন যে আমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারেন নি। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ ঐ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন।

বি: দ্র: আমরা মোফাজ্জল হোসেন সাহেবের এই লেখাটিতে কবি নজরুল সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং সে সময়ের কিছু ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতে পারব বলেই এটা আমার বইতে সংযোজন করলাম। ১লা জুন ১৯৭৫ এ জনাব মোফাজ্জল হোসেন কবি ভবনে এসে আমাকে সে সময়ের এই তথ্য দেন।

ই.ফা.বা-উ/৮৭-৮৮/প্র-৫০৭০/৩২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com